গোয়েন্দা পানু
সুমন্ত সোম

গোয়েন্দা পানু

কিশোর রহস্য কাহিনী

সুমন্ত সোম

আধুনিক পুস্তক প্রকাশন
৫০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

সোনালী ও পাপাইকে

প্রায় বারো বছর আগে গোয়েন্দা পানুর প্রথম মুদ্রণ হয়েছিল। মাঝখানে আরো দুটি মুদ্রণ হয়ে যায়। এটি এখন চতুর্থ মুদ্রণ। স্বভাবতই বোঝা যায়, বইটি কিশোর পাঠক মহলে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছে। এজন্য আমি আন্তরিক আনন্দিত। প্রকাশক শ্রী হিরণকুমার মুখোপাধ্যায় গোয়েন্দা পানুর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করার জন্য আগ্রহান্বিত। বেশ কিছু চিঠি এসে পৌঁছেছে ঐ দ্বিতীয় খণ্ডের দ্রুত প্রকাশের জন্য। আমি আশা করছি, খুব শীঘ্রই গোয়েন্দা পানুর দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রকাশক শ্রী হিরণকুমার মুখোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিতে পারবো। সুতরাং যারা গোয়েন্দা পানুর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ অপেক্ষায় বসে আছেন তাদের সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটবে নিশ্চয়।

॥ লেখক ॥

লেখকের অন্যান্য বই ঃ—

পূর্বরাগ—(২য় মুদ্রণ)

ভোরের কুয়াশা

প্রেম লজ্জাহীন

জয় বাংলার মুক্তি ফৌজ (নাটক)

পানু দশম শ্রেণীর বিজ্ঞানের ছাত্র। বয়স পনেরো। শক্ত সমর্থ চেহারা। গায়ের পেশীগুলি সুদৃঢ়। হাতের কব্জিতে প্রচুর জোর। মারামারি, খেলাধূলায় পানু পাড়ার মধ্যে অদ্বিতীয়।

পানু যে পাড়ায় থাকে, স্বভাবতই সে সেখানকার একজন ছোট-খাটো বীরপুরুষ। তাই পানু যখন যেখানে থাকে, সেখানে আর অন্য কোন বীরপুরুষের আবির্ভাব ঘটে না।

কিছু আগেকার এক ঘটনা। পানু রীতিমত একাই দশটি ছেলের সাথে মারামারি করেছে—সবাইকে সে জখম করেছে ; কেউ হাতে, পায়ে অথবা মাথায় চোট পেয়েছে ; আবার কারো চোখে বালি ছুড়ে মেরেছে। শেষোক্ত পদ্ধতি পানু আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োগ করেছিল। কারণ শেষপর্যন্ত ওকে তিনটি ছেলে প্রায় কাবু করে এনেছিল। কিন্তু হঠাৎ মাথায় এই বুদ্ধি আসায়—সঙ্গে সঙ্গে এই কৌশল প্রয়োগ করে নিজেকে বিপদ মুক্ত করেছিল। নইলে সেদিন পানুর কপালে যে কি লেখা ছিল, তা শুধু ভগবানই জানতেন।

যাই হোক, ঘটনার পর পানু আর আগের মত বেপরোয়া নয়। কারণ ওর বাবার কাছে পাড়ার অনেক ছেলের অভিভাবকরা নালিশ করেছেন—তিনি যেন তাঁর ছেলেকে শাসন করেন। সব সময় মারা-মারি, ফল চুরি, পুকুরের মাছ চুরি করে বেরাচ্ছে। ওর দেখাদেখি পাড়ার অন্য সব ছেলেরা খারাপ হয়ে যেতে পারে।

পানুর বাবা বিমলাপ্রসাদবাবু অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। অন্যায়কে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নি। এ ক্ষেত্রে তাই হল। পানু উপযুক্ত শাস্তি পেল। বাড়ী থেকে বেরোনো একেবারে নিষিদ্ধ। শুধু ভোরবেলায় পানু এখন বেরোতে পারে। বিকেলের দিকে এক

ঘণ্টার জন্য। তারপরই গৃহশিক্ষক আসেন। তাই পানু আর আগের মত বাইরে বেরিয়ে ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পায় না।

ক'দিন পানুর সত্যিই অসুবিধে হয়েছিল। জল থেকে মাছকে ডাঙ্গায় তুললে যেমন হয়, ঠিক তেমনি অবস্থা হয়েছিল পানুর। তবে ডাঙ্গায় মাছ খানিকক্ষণ থাকার পর মরে যায়—এ ক্ষেত্রে পানু মাছের মত মরে যায়নি ; বরঞ্চ ক্রমশঃ মন দিয়ে পড়াশুনা করার পর পানু বুঝেছে—পড়াশুনা একটা আনন্দের জিনিস। পড়াশুনার ভেতর দিয়ে সমস্ত জীবন ও জগতের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। সর্বোপরি, পড়াশুনা মানেই জীবনকে বিকাশ করা, নিজের অস্তিত্বকে মানুষের মত বাঁচিয়ে রাখা।

এই কয়েকদিনের মধ্যে পানু নতুন করে শিবাজী, আলেকজাণ্ডার ও নেপোলিয়নের জীবনী পড়েছে। আর মনের মধ্যে কেমন একটা উৎসাহের বীজ দানা বেঁধে উঠেছে। যদিও পানু বেশ ভালভাবে জানে, আজকের মানুষ তাদের মত শক্তিশালী রাজা হতে পারে না। কারণ এখন আইন-কানুন অনেক পালটে গেছে। রাজা হবার স্বপ্ন এখন কল্পনাতীত। তবে চেষ্টা করলে তাঁদের মত মহৎ শক্তিমান পুরুষ হওয়া যায়।

পানু যখন সকালবেলায় বেরোয়, তখন সঙ্গে ওর পোষা কুকুর বল্লু থাকে। বল্লুর বয়স এখন মাস পাঁচেক। এরমধ্যে দিব্যি ডাগর হয়ে উঠেছে। খুব জোরে ছুটতে পারে। মুখ দিয়ে বল লুফতে পারে। ছুটে গিয়ে দূর থেকে বলও নিয়ে আসতে পারে। বলতে গেলে বল্লুই এখন ওর খেলার সাথী।

পানু সকালের দিকে যেদিকে বেড়াতে যায়—সেদিকটা একটা ফাঁকা মাঠ। বড় বড় বট, অশ্বত্থ গাছ। সেখানে লোক চলাচল খুবই কম। কারণ এদিকটায়, বলতে গেলে এখনও বসতি গড়ে ওঠেনি। সব সময় কেমন একটা নিস্তব্ধ ভাব। ভর দুপুরে

এদিকে এলে গা-টা কেমন ছম্ ছম্ করে। আর রাতের বেলায় এখানে যে কি বিভীষিকার সৃষ্টি হয়—তা শুধু প্রত্যক্ষদর্শীরাই জানে। সবাই বলে—অনেকদিন আগে এখানে এক ডাকাত দলের আস্তানা ছিল। ডাকাতরা দূর গ্রামে গিয়ে ডাকাতি করত। ভোর বেলা সূর্য উঠবার আগেই তারা এখানে ফিরে আসত। এখানেই দিনের বেলায় জঙ্গলে লুকিয়ে থাকত। তারপর রাতের অন্ধকারে আবার তারা আত্মপ্রকাশ করত।

কিন্তু বেশীদিন এভাবে তারা থাকতে পারেনি। পাকা গোয়েন্দার হাত থেকে তারা মুক্তি পায়নি। একদিন সকালবেলায় কয়েকশত পুলিশ এসে সমস্ত জঙ্গল ঘিরে ফেলল। তারপর চলল গুলির আওয়াজ, বোমার আওয়াজ। সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য' সমস্ত ডাকাতেরা লড়াই করে প্রাণ হারিয়েছিল। কিন্তু আত্মসমর্পণ করলে তাদের এভাবে মৃত্যু বরণ করতে হ'ত না। কিন্তু তা তারা করেনি। তাই এতগুলি লোকের রক্তগঙ্গা বয়ে গিয়েছিল জঙ্গলের ভেতর। এখনও শোনা যায়, এই জঙ্গলের রক্ত শুকোতে প্রায় দিন তিনেক লেগেছিল।

সেই থেকে এদিকটা প্রায় পরিত্যক্ত। সবার মনেই কেমন একটা আতঙ্ক। এদিকে এলে কেমন একটা হিমেল হাওয়া হৃদ্‌পিণ্ডকে স্পর্শ করে। গায়ের রোমগুলি শিউরে ওঠে। সবাই বলে, ডাকাত-দের অশরীরী আত্মা এখনও এই ঘন জঙ্গলকে ত্যাগ করতে পারেনি —তারা এখনও অতৃপ্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে।

প্রতিদিনের মত পানু আজও এদিকে এসেছে। আগে বল্লু আনন্দে ছুটতে ছুটতে চলেছে। পেছনে পানু আসছে। তারপর উঁচু একটা পাথরের ঢিপির ওপর গিয়ে পানু বসল। আর বল্লু কি শুঁকতে শুঁকতে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগল, তা পানু এক-বিন্দুও বুঝল না।

পানু একটু অন্যমনস্ক হয়ে একটি পাখীর দিকে তাকিয়েছিল।

হঠাৎ বল্লুর একটা বিকট চিৎকার শুনে পানু শিউরে উঠল। কারণ বল্লুর এমন বিকট চিৎকার পানু কোনদিন শোনেনি। পানু নিশ্চিত বুঝল—বল্লু নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছে।

পানু তাড়াতাড়ি চিৎকার লক্ষ্য করে সেদিকে এগিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পানু দেখতে পেল বল্লুকে। বল্লুর চোখ লাল হয়ে উঠেছে। লেজটা অনেকটা নীচের দিকে নেমে গেছে। এগুলি সঠিক ভয় পাবারই লক্ষণ।

পানু সবদিকেই ভালভাবে দেখল। কিন্তু কিছুই ও দেখতে পেল না, কি আশ্চর্য!

বল্লু ইতিমধ্যে বার দুয়েক গর্জন করল। দৃষ্টি ওর উত্তর দিকটায়। ওদিকটায় আরো ঘন জঙ্গল। ভোরের আলো এখনও সেখানে স্পষ্ট ভাবে পৌঁছায়নি।

বল্লুর জিভ বেরিয়ে পড়েছে। এখন হাঁপাচ্ছে। আর মধ্যে মধ্যে উত্তর দিকটায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

পানু বল্লুর দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর গা-টা চাপড়ে দিল। ভাবটা এই—ভয় পাচ্ছিস কেন? আমি তো রয়েছি।

॥ ২ ॥

ঘটনাটা বাড়ী যেতে যেতে পানু অনেকক্ষণ ভাবল। কিন্তু কোন হদিস খুঁজে পেল না। কি দেখে বল্লু তাহলে অমন বিকট চিৎকার করল?

বাড়ীতে ফিরে পানুর মন পালটে গেল। এতক্ষণ ঐ চিন্তাতেই মন আচ্ছন্ন ছিল। বাড়ীর পরিবেশে ঘটনাটি ক্রমশঃ অপসৃত হল।

পরদিনও ভোর বেলায় পানু এদিকটায় বেড়াতে এল। আজকে পানুর সতর্কদৃষ্টি। সব সময় নিপুণ শিকারীর মত চারদিক লক্ষ্য রেখেছে। কিন্তু কোথাও ওর নজরে কিছু পড়ল না।

পানু সেই পাথরের উঁচু ঢিপির ওপর গিয়ে বসল। বল্লু ওর নিত্য অভ্যেসের মত মাটি শুঁকতে শুঁকতে উত্তর দিকটায় চলেছে।

পানু লক্ষ্য করল উত্তর দিকের বড় একটা গাছের ডাল যেন হঠাৎ অস্বাভাবিক ভাবে নড়ে উঠল। অন্যান্য গাছগুলি সব স্থির। যেন তারাই এই দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে রইল।

পানুর গা-টা এবার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ভাল করে পানু আবার চারিদিক দেখল। গা-টা ওর এবার ছম ছম করে উঠল। বুকের হৃদপিণ্ডটা দ্রুত চলতে লাগল। পানু যেন কিছুটা ভয় পেয়েছে।

পানু পাথরের ঢিপির উপর দাঁড়িয়ে বল্লুকে ডাকল। ফাঁকা জায়গায় পানুর ডাক বড় বড় বট, অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় কতকটা প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল।

বল্লু ডাক শুনতে পেয়েছে। প্রভুর ডাকে বল্লু সেখান থেকে ঘেউ ঘেউ করে সাড়া দিল। সে কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এল।

বোঝা গেল আজকে বল্লু মোটেই ভয় পায়নি। লেজ বেশ সহজভাবেই খাড়া হয়ে আছে। কান দুটো বর্শার মত উঁচু হয়ে আছে। সামনে এসে বল্লু বার কয়েক তাকাল পানুর দিকে। ভাবটা এই—খবর কি? তুমি ডাকলে কেন হঠাৎ অমন করে?

পানু বল্লুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। ওর রোমশ দেহখানা যেন আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠল। সামনের দিকে পা দু'খানা ভেঙ্গে আহ্লাদী সুরে বার কয়েক ডেকে উঠল। তারপর ঘন ঘন লেজ নাড়তে শুরু করল।

পানু আর বেশীক্ষণ এদিকটায় রইল না। বল্লু কাছে থাকা সত্ত্বেও কেমন যেন ওর গা-টা ছম্ ছম্ করছে। সব সময় একটা আতঙ্ক—হয়ত পেছন দিক থেকে একটা বিপদ ঘটতে পারে।

দিন কয়েক বাদে পানুর এক মাসতুতো ভাই এল। সে

কলকাতায় থাকে। নাম পিণ্টু। বয়সে সে পানুর প্রায় সমান তবে দেহের গড়নে পানুর চেয়ে সে অনেক নীচে।

সকাল বেলায় পানু যখন বেরুবার উদ্যোগ শুরু করল, তা দেখে পিণ্টু বলল, তুই কোথায় যাচ্ছিস রে?

পানু বলল, বেড়াতে।

পিণ্টু বলল, আমিও যাব।

পানু খুশী হল। বলল, চল।

পিণ্টু তাড়াতাড়ি জামা প্যাণ্ট পরে নিল। বলল, এসে দাঁত মেজে নেবো।

পানু বলল, দাঁতটা এখনই মেজে নে। বাসী মুখে বেশীক্ষণ থাকতে নেই। নইলে কেমন একটা অস্বস্তি হবে।

পিণ্টু তাই করল। তাড়াতাড়ি মাজন দিয়ে দাঁত মেজে নিল।

সামনের ঘরে বিমলাপ্রসাদবাবু ঘুমান। তিনি অনেক ভোরে ওঠেন। পানুকে বেরতে দেখে বললেন, এত ভোরে বেরিয়ো না— এখনও অন্ধকার কাটেনি। একটু অপেক্ষা করে যাও।

পানু বলল, অন্ধকার এখুনি কেটে যাবে বাবা। বড় রাস্তার মোড়ে গেলেই অন্ধকার মিলিয়ে যায়। আমি প্রত্যেক দিন দেখছি বাবা।

ওরা বেরিয়ে পড়ল বল্লুকে নিয়ে। বল্লু সতেজ দেহখানা নিয়ে উল্লাসে আগে আগে ছুটতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা জঙ্গলের ধারে পেঁছে গেল।

পিণ্টু বলল, কিরে এদিকটায় একদম মানুষ নেই?

না। এদিকটা একেবারে ফাঁকা। আগে এখানে ডাকাত থাকতো।

কথাটা শুনে পিণ্টুর গা-টা এবার ছ্যাৎ করে উঠল। বলল, ডাকাত!

হ্যাঁরে। এখন অবিশ্যি নেই। সব কটা মারা গেছে।

কারা মারলে ?

কেন, পুলিশেরা।

খানিকটা এগিয়ে পিণ্টু বলল, বেশ একটা বড় মাঠ আছে দেখছি ?

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে এখানে ফুটবল খেলা হয়।

ইস্, এত সুন্দর মাঠ আমাদের কলকাতায় থাকলে, আমরা রোজ খেলতাম।

কেন তোদের সেখানে খেলার অসুবিধে হয় নাকি ?

বা রে—অসুবিধে আবার হয় না। আমরা তো মাঠের অভাবে গলির মধ্যে ফুটবল খেলি।

পানু বলল, তোরা আর কি কি খেলিস ?

সে অনেক কিছু।

কি বল না ?

ফুটবল, ক্রিকেট. ব্যাডমিণ্টন, সে অনেক কিছু।

এখানে তোদের মত খেলা হয় না। রবারের বল অথবা ছোট বাতাবী লেবু দিয়ে বেশী খেলা হয়। আর এ ছাড়া প্রায় সব সময় ডাং-গুলী খেলা হয়।

তারপর পানু আরো কিছু বলতে শুরু করেছিল—কিন্তু সেই মুহূর্তে বল্লুর গগনভেদী আর্তনাদ চারদিক কাঁপিয়ে তুলল। এ যে বল্লুর মরণ আর্তনাদ তা যেন পানু সহজেই বুঝলো।

পানু সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতগতিতে শব্দ লক্ষ্য করে সেদিকে ছুটে গেল। সঙ্গে পিণ্টুও কতকটা ভয় পেয়ে পানুকে অনুসরণ করল। বল্লুর মরণ চিৎকার তখনও কঁকিয়ে কঁকিয়ে উঠছিল। শব্দ লক্ষ্য করে বল্লুকে খুঁজে পেতে পানুর কোন অসুবিধে হল না। দেখতে পেল একটা বড় গাছের গোড়ায় বল্লুর রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়েছে। ঘাড়ের পাশ দিয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। সেখান থেকে ফিনকি দিয়ে তাজা রক্ত বেরুচ্ছে।

পানুকে দেখতে পেয়ে বল্লু বার দুয়েক উঠবার চেষ্টা করল। চোখে ওর করুণ দৃষ্টি। বুঝি অসহ্য বেদনা সহ্য করতে না পেরে চোখ দিয়ে জলও ঝরে পড়ছে।

পানু কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এখন ও কি করবে ভেবে পেল না। আর কি-ই বা করার আছে পানু ঠিক বুঝতে পারল না।

পিণ্টু সন্ত্রস্ত হয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, কে মারল, বলতো? এ যে খুব ধারালো অস্ত্র দিয়ে মেরেছে দেখছি।

পানুকে দেখতে পেয়ে বল্লু বার দুয়েক উঠবার চেষ্টা করল।

পানু কোন জবাব দিতে পারল না। বল্লুর এই রক্তাক্ত দৃশ্য যেন ওর বুকে শেল বিঁধিয়ে দিয়েছে।

পিণ্টু বলল, একটু জল দে পানু। মুখটা কেমন করছে।

পানুর এতক্ষণে খেয়াল হল। স্নায়ুমণ্ডলীগুলি যেন সতেজ হয়ে উঠল। পানু এবার জল আনবার জন্য ছুটল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে পানু জল নিয়ে এল। একটু জল ও বল্লুর মুখে ঢেলে দিল।

জল পেয়ে বল্লু যেন একটু নড়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি ওর ক্রমশঃ স্থির হয়ে এল। কয়েক মিনিট পরেই বল্লুর প্রাণবায়ু নিভে গেল।

পানুর চোখে জল। এই কয়েক বছরের মধ্যে পানু বোধ হয় আর কাঁদেনি। পানু নিজেই রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিল।

পিণ্টু একটু বিচলিত হয়ে বলল, বাড়ীতে খবর দিবি?

একটু ভেবে পানু বলল, না।

তাহলে এখন কি করবি?

পানু উত্তর না দিয়ে—বল্লুর রক্তাক্ত মৃতদেহটা তুলে নিল নিজের হাতে। তারপর এগিয়ে চলল, একটি পুকুরের ধারে।

পুকুরের ধারে পেঁছে পানু বলল, এভাবে ফেলে দিলে—শকুনে ছিঁড়ে খাবে। তুই এক কাজ কর বাড়ী থেকে একটা কোদাল নিয়ে আয়। এই পুকুর পাড়ে ওকে কবর দিয়ে যাবো।

পিণ্টু আর সময় নষ্ট করল না। ও তখুনি বাড়ী থেকে একটা কোদাল নিয়ে এল।

পানু একটা বেশ বড় করে তিন ফুট গর্ত করল। তারপর বল্লুর দেহখানা খুব সন্তর্পণে শুইয়ে দিল। ধীরে ধীরে শোকার্ত ভাবে মাটি চাপা দিল।

এখন যেন কেমন একটা শূন্যতা পানুকে চেপে ধরেছে। দুঃখটা বড় বেশী করে গভীর হয়ে লাগছে। এই সময় তো সে বল্লুকে নিয়ে বাড়ী ফিরতো। ক্লান্ত বল্লু তখন বাড়ী ফিরে প্রাণভরে জল পান করত। কিন্তু আজ? এই প্রশ্নে পানুর বেদনার অনুভূতিটা যেন হাহাকার করে উঠল।

পানু বার বার জঙ্গলের চারিদিক দেখল। কি যেন ও খুঁজছে। যার দেখা পেলেই পানুর চেহারা এক মুহূর্তে সম্পূর্ণ পালটে যেতে পারে। বল্লুর হত্যার প্রতিশোধ নির্মমভাবে নিতে পারে।

কিন্তু কই ? পানুর চোখে কিছুই তো পড়ছে না। একটু সামান্য সন্দেহ করবার মত আভাস পর্যন্ত পেল না। একটা আশ্চর্য রহস্যময় হত্যাকাণ্ড !

হঠাৎ পানুর একটা কথা মনে পড়ল। হ্যাঁ, ঐ গাছটাই তো সেদিন অস্বাভাবিকভাবে নড়ে উঠেছিল। আর ঐ গাবগাছের গোড়ায় বল্লুর দেহটা পড়েছে। তা হলে কি ওখানেই কিছু রহস্যের ইঙ্গিত রয়েছে ?

পানুর মন সায় দিল—হ্যাঁ, এখানেই একটা কিছু গোপনীয় ব্যাপার রয়েছে। এখানেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হবে রাতের অন্ধকারে। এই হত্যার রহস্যকে ওকে খুঁজে বের করতেই হবে। একটা সামান্য জীবকে হত্যা করবার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে ? আর এখানেই বা হত্যা করার কি যুক্তি আছে ?

॥ ৩ ॥

বিষণ্ণ মনে পানু বাড়ী ফিরে এল, সঙ্গে পিণ্টু। একটুও স্বস্তি পেল না। বেচারা ক'দিনের জন্য একটু বেড়াতে এসেছে। আনন্দ হৈ-হুল্লোড় করে ক'টা দিন কাটিয়ে যাবে। অথচ এর মধ্যে কি দুঃখ-জনক ঘটনা ঘটল।

দুপুরের দিকে বল্লুর খোঁজ পড়ল। পানুর মা এ সময়ে বল্লুকে খেতে দেন। কিন্তু বল্লু কই ?

পানুর মা বললেন—পানু বল্লুকে দেখতে পাচ্ছি না। ও কোথায় ?

পানু বলল, ও আর আসবে না মা। ও আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।

পানুর মা কিছুই বুঝতে পারলেন না। বললেন, ও কোথায় গেছে ?

তখন পানু সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল।

সব শুনে পানুর মা বললেন, আমি হাজার বার বারণ করেছি—ঐ দিকটায় বেড়াতে যাস না। ওদিকটা মোটেই ভাল জায়গা নয়। আমার কথা শুনলে না—এখন দেখ কি ফল হল।

পানু চুপ করে রইল, কোন উত্তর দিল না।

বিমলাপ্রসাদবাবুও ঘটনাটা শুনেছিলেন। কিন্তু তিনি খুব একটা গুরুত্ব দিলেন না। কেন দিলেন না, তা বোঝা গেল না। অথচ তিনি বল্লু সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন।

পানু সন্ধ্যে বেলায় পিণ্টুর সাথে পরামর্শ করে রাখল, রাত বারোটার পর ওরা সেই জঙ্গলের ধারে যাবে। আজকে সারারাত ওরা লক্ষ্য করবে সেই জায়গাটা—যেখানে বল্লুকে হত্যা করা হয়েছে নৃশংস ভাবে।

পিণ্টু প্রথমে একটু আপত্তি জানিয়েছিল। বলেছিল, মেসো মশাই যদি টের পান ?

পানু বলেছে, বাবা টের পাবেন না। আমরা দরজা খুলে প্রাচীর টপকে যাব। আবার ভোর-রাতেই ফিরে আসব।

কিন্তু তবুও এ ব্যাপারে পিণ্টুর মোটেই ইচ্ছে ছিল না। এত বড় দুঃসাহসিক কাজ জীবনে ও কোনদিন করে নি। তার চেয়ে বড় কথা—একা একা দু'জনে এতটা পথ হেঁটে গিয়ে সেই রহস্যময় জঙ্গলে গভীর রাতে প্রবেশ করা—কি যে এক বিপদের ঝুঁকি নেওয়া, তা পিণ্টু মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে ভয়ে শিউরে উঠল। যাই হোক, শেষপর্যন্ত পানুর দৃঢ় সংকল্পে পিণ্টু রাত্রির অভিযানে বেরুতে রাজী হল।

ঢং ঢং করে বাড়ীর দেওয়ালঘড়িটা বারটা ঘোষণা করল। পানু এতক্ষণ চোখ বুঁজে শুয়েছিল। এবার ও উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে পিণ্টুও উঠল।

বাড়ী নিস্তব্ধ। পানুর বাবা সামনের ঘরে ঘুমোচ্ছেন। মা পিছনের ঘরে। মাঝখানের ঘরে ওরা ছিল।

সন্তর্পণে দরজা খুলে পানু বাইরে এসে দাঁড়াল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। আকাশে আলোর রেশ মাত্র নেই। শুধু দূরে তারাগুলি মিট মিট করছে।

পানু দরজাটা ভাল করে টেনে দিয়ে, পিণ্টুকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে বাইরের রাস্তায় এসে দাঁড়াল। ঘুটঘুটে অন্ধকার দেখে পিণ্টু বলল, পানু, এভাবে বেরোনো ঠিক হবে না।

পানু বিরক্তি প্রকাশ করল। বলল, তাহলে তুই ফিরে যা—আমি একাই যাব।

অগত্যা পিণ্টু পাটুকে অনুসরণ করল।

মন্হর গতিতে এগোচ্ছে। মাঝে মাঝে টর্চের আলো জেবলে রাস্তাটি ঠিক করে নিচ্ছে। জঙ্গলের কাছাকাছি আসতে কতকগুলি শেয়াল ডেকে উঠল—কি বিশ্রী ডাক! পিণ্টুর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল।

পানু এবার কোমর থেকে একটা ছোরা বার করল। টর্চের আলোতে ছোরার ফলাটা চিক্ চিক্ করে উঠল। বলল, এটা তোর হাতে রাখ। কখন দরকার হয়, বলা যায় না।

পিণ্টু সভয়ে ছোরাটা হাতে নিয়ে বলল, তোর হাতে থাকবে না?

আমার হাতে তো আছে।

কোথায়?

পানু সঙ্গে সঙ্গে হাতের সরু ছড়িটায় মোচড় দিয়ে একটা ক্রাচ বার করে দেখাল।

এমন অস্ত্র পিণ্টু কোনদিন দেখেনি। বাইরে থেকে দিব্যি দেখে মনে হবে—এটা একটা সাধারণ ছড়ি। কিন্তু এর ভেতরে যে একটা তীক্ষ্ম অস্ত্র লুকানো আছে তা বাইরে থেকে একটুও বোঝা যায় না।

পানু সাধারণতঃ যে রাস্তা দিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢোকে, আজ সেদিকে গেল না; ও দক্ষিণ দিকটায় গেল। এদিকটায় আরো গভীর জঙ্গল। ওদের উপস্থিতিতে কতকগুলি নিশাচর পাখীর ডানার ঝটপট শব্দ শোনা গেল। অদূরে একটা নাম-না-জানা জন্তু বিশ্রী ভাবে ডেকে উঠল।

পানু এবার একটা বড় গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল। বুঝল, এভাবে এগোলে ওদের উপস্থিতি ওরা টের পেয়ে যাবে।

পিণ্টু আস্তে আস্তে বলল, আমাদের বোধ হয় চলার শব্দ হচ্ছে।

হ্যাঁ।

একটু দাঁড়িয়ে নে।

খানিকক্ষণ থেমে ওরা জঙ্গলের অবস্থা অনুমান করে নিল। আবার খুব সন্তর্পণে চলতে শুরু করল।

কিছুটা যেতে পানু এবার থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ একটা মৃদু আলো যেন উত্তর দিকে দেখতে পেল। আলোটা ক্রমশঃ ওদের দিকেই আসছে।

পানু তাড়াতাড়ি পিণ্টুকে নিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। ফিস্ ফিস্ করে পানু বলল, তুই ঐ গাছের পাশটায় গড়িয়ে চলে যা। দুজনের একসাথে থাকা নিরাপদ হবে না।

পিণ্টু সঙ্গে সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে অন্য পাশে সরে গেল।

আলোটা আরো কিছুটা এসে থেমে গেল। অনেকক্ষণ একই জায়গায় স্থির হয়ে রইল।

পানুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আলোর দিকে। দেখে মনে হবে ওর চোখের পাতার পলক পড়ছে না। ওর সমস্ত স্নায়ু ও চেতনা যেন সজাগ হয়ে আছে আলোর দিকে।

আলোটা এখন ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। মুহূর্তের জন্য একটু নড়ে উঠল। তারপর হঠাৎ মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

পিণ্টু এতক্ষণ ধৈর্য ধরে বসেছিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ওর-ও ছিল। পানুর মত অতটা নয়।

পানু আর এগোল না। আজকে আর না এগোনই সঙ্গত বলে মনে করল। আজকে ওর প্রথম অভিযান সার্থক হয়েছে। রহস্যের স্পস্ট ইঙ্গিত আজকে ও প্রত্যক্ষ করেছে। এবার পরবর্তী পদক্ষেপ-গুলি ধীর স্থিরভাবে ঠিক করতে হবে। বিচার বিশ্লেষণে পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে। কারণ প্রতিপক্ষ দলবদ্ধভাবে আছে বলে মনে হয়। সেক্ষেত্রে পানু আর পিণ্টু একা। বয়স দুজনেরই গন্য করার মত কিছু নয়। অভিজ্ঞতায় এখনও যৌবনে পা দেয়নি। তবে ইচ্ছা বা আগ্রহে দীপ্তির ভাব আছে। এই দুই সম্বলে হয়তো এরা একটা রহস্যভেদ করতে পারে।

বাড়ী যেতে যেতে পিণ্টু বলল, রাত কটা হবে এখন?

পানু পকেট থেকে রেডিয়ামযুক্ত হাতঘড়িটা বার করে বলল, আড়াইটে।

পিণ্টু বলল, যেতে যেতে তিনটে হয়ে যাবে।

অনেকটা পথ এগিয়ে এসে পানু বলল, এখন দিন সাতেক এখানে আসতে হবে। সব কিছু খুঁটিনাটি লক্ষ্য করতে হবে। তারপর যদি এ রহস্য উন্মোচন করা যায়।

পিণ্টু বলল, ব্যাপারটা বোধ হয় মেসোমশাইকে বললে ভাল হবে। আমরা একা বোধহয় কিছুই করতে পারবো না।

খানিকক্ষণ থেমে পানু বলল, এখন বলতে হবে না, আগে একবার চেষ্টা করে দেখা যাক্।

পিণ্টু বলল, আচ্ছা উত্তর দিকটায় জঙ্গলের শেষে কি আছে?

নদী।

আমাদের একবার দিনের বেলায় ওদিকটা দেখে আসা দরকার।

পানু বলল, ঠিক বলেছিস। আজকে বিকেলের দিকে যাবো।

ওরা কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ী পৌঁছে গেল। প্রাচীর টপকে পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে ঢুকল। তারপর দুজনেই বিছানায় পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ল।

॥ ৪ ॥

একটু বেলা থাকতেই পানু বাড়ী থেকে বেরুল। সঙ্গে পিণ্টুও রয়েছে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে না গিয়ে, ওরা বাঁ পাশ দিয়ে নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছল।

নদীতে এখন জোয়ার চলেছে। ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউ এসে পাড়ে আঘাত করছে। পাড় ভেঙ্গে নদীর কূল অনেকটা এগিয়ে এসেছে। আরো এগোবে। কারণ বড় বড় ফাটল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এবারের বর্ষায় হয়ত এটুকু নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।

নদীর পাড় ধরে ওরা জঙ্গলের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। কেমন একটা ঠাণ্ডা বাতাসে ওদের গাটা শির শির করে উঠল। পানু ভাল ভাবে নিরীক্ষণ করল জায়গাটা। কোন প্রাণী নেই। কোন

মানুষের চিহ্ন নেই। শুধু দূরে একটা বড় নৌকা নোঙ্গর করা রয়েছে। তাতে মাঝি মাল্লা কিছু দেখা যাচ্ছে না।

পিণ্টু বলল, জায়গাটা কেমন নির্জন দেখেছিস? গা'টা আপনা থেকেই শিউরে ওঠে।

পানু কোন জবাব দিল না। ও লক্ষ্য করল এবার মাটির দিকে। সেখানে গুটি কয়েক পায়ের দাগ রয়েছে। এবং তা কিছুটা এসে জঙ্গলের ভেতর মিলিয়ে গেছে।

পানু বলল, চল।

পিণ্টু ওর পেছনে চলল।

খানিকটা এগিয়ে পানু বলল, আমার মনে হয় এখানে বিরাট একটা দল আছে। কিন্তু কি যে এদের লক্ষ্য তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। অথচ এদিকে তো ডাকাতির কোন খবর পাওয়া যায়নি। আর বল্লুকেই বা হত্যা করার কি কারণ থাকতে পারে?

পিণ্টু বলল, এ-ও হতে পারে ওরা চায় না—ওদের আস্তানায় কোন চতুষ্পদ প্রাণী আসুক। হয়ত ওদের ঘ্রাণশক্তিকে খুব ভয়। কারণ সারমেয়র যাতায়াতের মধ্যে কোন মানুষ এ জায়গায় আসতে পারে। এবং মানুষ এলেই ওদের গোপন আস্তানা প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। এই আশংকায় ওরা বল্লুকে হত্যা করেছে।

পানু বলল, হতে পারে। কারণ শেয়ানা গুণ্ডা বদমাসরা সত্যি সারমেয়র ঘ্রাণশক্তিকে ভয় করে।

পিণ্টু বলল, কিন্তু আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না—কী এমন জিনিস আছে এই জঙ্গলের ভেতর, যাতে বল্লুকে হত্যা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল?

পানু বলল, সেইটাই তো আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে বল্লুর হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে।

দেখতে দেখতে বেলা শেষ হয়ে এলো। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ দিনের আলো মুছে দিল। রাতের অন্ধকার গভীর হল।

একটু পরে মেঘ করে এল। সঙ্গে একটু ঝড়ের আভাস। ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগছে।

পানু বলল, বেশী বৃষ্টি হবে না।

কেন ?

দেখছিস না হাওয়া রয়েছে। হাওয়া থাকলে বেশী বৃষ্টি হয় না, মেঘগুলিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

বৃষ্টি শুরু হল। বাইরে বিদ্যুৎ চমকালো কড়াৎ কড়াৎ করে। দু'বার যেন কোথায় বাজ পড়ল।

পিণ্টু বলল, আজকে আর গিয়ে কাজ নেই পানু—

পানু বলল, আজকেই যাওয়া সবচেয়ে সুবিধে। কারণ বৃষ্টির মধ্যে অত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে পারবে না ওরা। আর আমরাও কাছাকাছি গিয়ে সমস্ত লক্ষ্য রাখতে পারব।

বাড়ীর সকলের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। শুধু পানুর মা বাকী। তিনি একটু পরে খাবেন। একবার তিনি এসে পানু আর পিণ্টুকে দেখে গেলেন। বললেন, কিরে তোরা এখনও বসে রয়েছিস ? শুয়ে পড়।

পানু বলল, এবার শোব মা।

ধীরে ধীরে রাত বাড়ল। পানুর মার খাওয়া হয়ে গেছে। বাড়ী নিস্তব্ধ। পানু রেডিয়ামযুক্ত হাতঘড়ি দেখে বলল, রাত এখন সাড়ে বারটা। আমাদের এখনই বের হওয়া উচিত।

পিণ্টু তৈরী হয়ে পানুর পিছু নিল। একটু বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির ধারা দেখে মনে হল, বৃষ্টি আরো জোরে নামবে। অথচ একটু আগে হাওয়া ছিল। তাই পানুর মনে হয়েছিল বেশীক্ষণ বৃষ্টি হবে না।

পিণ্টু মুখ কাচু-মাচু করে বলল, এ বৃষ্টিতে একেবারে ভিজে যাবো। তারপর ঠিক সর্দিজ্বর হবে।

পানু সর্দিজ্বরের কথা ভাবল না। বৃষ্টিতে সমস্ত জামা প্যাণ্ট ভিজে গেলে, দ্রুত চলাফেরার অসুবিধে হয়। এতে পর্যবেক্ষণের বিঘ্ন ঘটতে পারে।

পানু বলল, তুই এখানে দাঁড়া, ঘরে দু'খানা বর্ষাতি আছে। ও-ই দুজনে গায়ে দিয়ে বেরোবো।

পিণ্টু বলল, একটা তো মেসোমশাইয়ের।

হ্যাঁ, বাবারটা আমি গায়ে দেবো! তুই আমারটা গায়ে দিবি।

মেশোমশাইরটা তোর হয়?

হ্যাঁ, শুধু লম্বাটা একটু বেশী।

পানু আর দেরী না করে নিঃশব্দে বর্ষাতি দুটো নিয়ে এলো। তারপর দুজনে ভাল করে পরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল।

খানিকটা যেতেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। পানু টুপিটা আর একটু সামনের দিকে নামিয়ে দিল। বৃষ্টির ঝাপটা মুখে এসে লাগছিল।

পিণ্টু বলল, একটু দাঁড়িয়ে নে পানু বড্ড বৃষ্টি পড়ছে।

পানু বলল, এ বৃষ্টি সহজে থামবে না। এরই মধ্যে আস্তে আস্তে এগিয়ে চল।

গুটি গুটি করে ওরা নদীর ধারে এসে পেঁছিল। ঘন অন্ধকার আর প্রবল বৃষ্টিতে রাস্তাটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পানু বলল, দেখে পা দিস, বৃষ্টি হচ্ছে, মাটি এখন নরম। যে কোন মুহূর্তে পাড় ভেঙ্গে পড়তে পারে।

যেমন বলা, ঠিক তেমনি হল। সামনের দিকে একটা বিরাট ধ্বস নামল। আর একটু হলেই ওদের দুজনকে নিয়ে ধ্বস জলে গিয়ে পড়ত।

পানু পিণ্টুর হাত ধরে সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত পিছিয়ে গেল। ঈশ্বর ওদের রক্ষা করেছেন। নইলে কি বিপদ ঘটতো ভগবান জানেন। বুকটা ওদের দুর দর করে কাঁপছে।

পিণ্টু বেশ ভয় পেয়েছে। পানুর হাতটা বেশ জোরেই চেপে ধরেছে। বলল, আজকে ফিরে চল পানু, বারে বারে বাধা পড়ছে। কালকে আসবোখন।

পানুরও কতকটা তাই ইচ্ছে। এই গভীর রাতে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে কেমন যেন একটা অজানা ভয়ে শিউরে উঠল। বুকের হৃদ্‌পিন্ডটা কেমন যেন দ্রুত চলতে লাগল। পানু এই দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলবার জন্য দু'বার বড় বড় করে শ্বাস নিল। শ্বাস টেনে বুক ফুলোলে দেহে মনে শক্তি আসে। পানু বার দুয়েক তাই করল।

আরেকটু এগোতে একটা তীব্র আলো দপ্‌ করে জ্বলে উঠে নিভে গেল।

এবার দুজনেই সচকিত হয়ে উঠল। এত রাতে আলো জ্বলে উঠল কোথা থেকে ? এই আলোটা আগের দিনের চেয়ে আরো জোরালো।

কয়েক মিনিট পর আলোটা আবার জ্বলে উঠল। এবার সার্চ লাইটের মত ধীরে ধীরে নদীর পাড়ের দিকে কি যেন অনুসন্ধান করতে লাগল।

পানু আর দেরী না করে, পিণ্টুকে ধরে সঙ্গে সঙ্গে কাদার মধ্যে লেপটে শুয়ে পড়ল।

আলোটা ওদের প্রায় কাছাকাছি এসে থেমে গেল।

পানু ফিস ফিস করে বলল, দেখেছিস ওদের কেমন সতর্ক দৃষ্টি। বোধহয় ধ্বস নামার শব্দ শুনেছে। তাই একবার পরখ করে দেখে নিল, সত্যি কি না!

আলোটা এবার নিভে গেল। পিণ্টু উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু পানু উঠতে দিল না। বলল, এখন উঠিস না। সময় নে। যদি আবার সামনের দিকে জ্বলে ওঠে!

খানিকক্ষণ কাদার মধ্যে শুয়ে থাকার পর ওরা উঠল। ভারী এঁটেল মাটির কাদা সর্বাঙ্গে লেগে আছে।

পিণ্টু বলল, চল জঙ্গলের ধারটা ঘেঁসে যাই। এ রাস্তার সামনের দিকে আর একটা বড় ফাটল দেখে গিয়েছিলাম। আবার কোন বিপদ ঘটতে পারে।

পানু রাজী হল। নদীর পাড়ের রাস্তা ছেড়ে এবার জঙ্গলের ধার ধরে এগোতে লাগল।

যেতে যেতে পানু এবার হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। দেখতে পেল আগের দিনের মত আরেকটি মৃদু আলো। এ আলোটি সার্চ লাইটের মত তীব্র নয়।

পানু আর এগোল না। সেখানেই সতর্ক হয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল। আলোটা এবার নদীর দিকে ক্রমশঃ এগোতে শুরু করল। তারপর ওপরের দিকে উঠে বৃত্তাকারে দু'বার ঘুরে গেল। দেখে মনে হল যেন, কোন মানুষ বোধহয় আলোটি তুলে ঘুরিয়ে কাউকে নিশানা করল।

পানু রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলল, পিণ্টু তুই এখানে থাক। আমি আরেকটু এগিয়ে গিয়ে দেখি।

পিণ্টু শুনল না। ও রহস্যের স্বাদ পেয়েছে। বলল, আমিও যাবো।

ওরা দুজনে হামাগুড়ি দিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেল।

এবার আলো থেকে দূরত্ব হল মাত্র ত্রিশ গজের মত।

মিনিট দশেকের মধ্যে একটা নৌকা নদীর ধারে এসে পেঁছিল।

পিণ্টু বলল, দেখেছিল, এ নৌকাটা দিনের বেলায় নোঙ্গর অবস্থায় ছিল।

পানু রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলল, হ্যাঁ, এখন কোন কথা বলিস না। শুধু চুপ করে দেখে যা।

নৌকাটি আসার সঙ্গে সঙ্গে আলোর উজ্জ্বলতা আরো বেড়ে গেল। ফলে আগের চেয়ে ওরা স্পষ্ট দেখতে পেল সব কিছু।

এবার একটা মোটা দড়ি নৌকা থেকে কে যেন নিক্ষেপ করল। পাড়ের লোকটি বিশেষ তৎপরতার সাথে একটা গাছের গোড়ায় তা বেঁধে দিল। তারপর নৌকা থেকে জনচারেক ষণ্ডা মার্কা লোক নেমে জঙ্গলের ভেতর চলে গেল।

পানু আর ঐ জায়গা থেকে একচুল নড়ল না। ওরা সেই অজ্ঞাত রহস্যের সঠিক সন্ধান পেয়েছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে ওরা বাকীটুকু দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর একটা লোক মাথায় করে কি যেন নিয়ে এসে নৌকার ভেতর রাখল। এভাবে জনা তিনেক লোক প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সেই জিনিষ গুলি রাখল।

পিণ্টু অধৈর্য হয়ে ফিস ফিস করে বলল, কি রাখছে বলতো?

কি জানি, বুঝতে পারছি না। তবে বস্তাটা যে ভারী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ বস্তা রাখার সাথে সাথে নৌকাটি বেশ দুলে উঠছে।

এবার লোকগুলি এক সাথে জড় হল। নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করল, তা একবর্ণ বোঝা গেল না।

একজন উঠে গিয়ে গাছের সাথে বাঁধা দড়িটা দ্রুত খুলে দিল। আরেকজন সেটাকে গুটিয়ে নৌকার ভেতর রাখল। তারপর যে চারজন নৌকা থেকে নেমেছিল, একে একে তারা উঠে পড়ল। কিছু-ক্ষণের মধ্যে নৌকা ছেড়ে দিল।

নদীতে জোয়ার ছিল। বেশ দ্রুত গতিতে নৌকা চলতে শুরু করল। দেখতে দেখতে নৌকা ঘন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পানুর দৃষ্টি এখন সতর্ক শিকারীর মত সমস্ত পর্যবেক্ষণ করছে। মৃদু আলো হাতে লোকটি কে? লোকটি এখন কোথায় যাবে? আর এই বস্তাগুলি বা কোথা থেকে এলো? কী ই বা আছে এতে যা এমন গভীর রাতে গোপনে পাচার করা হল!

এ রকম অসংখ্য প্রশ্ন পানুর মনে উদয় হতে লাগল। অথচ পানু কোন সদুত্তর খুঁজে পেল না। প্রশ্ন গুলি যতই ভাবতে লাগল, ততই পানুর মনে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠতে লাগল। হ্যাঁ, পানু নিশ্চয় এই প্রশ্নের উত্তরগুলি খুঁজে পাবে! আর এই রহস্যের যবনিকা ভেদ করতে পারবে। পরিশেষে বল্লুর হত্যার প্রতিশোধ নেবে।

॥ ৫ ॥

বাড়ী ফিরে পানুর ভাল ঘুম হয়নি। সব সময় ঘটনাটা ওর মাথার ভেতর ঘুরছে। এখন কিভাবে এগোলে, খুব সহজেই এর মীমাংসা করা যায়!

একবার ভাবল থানায় গিয়ে জানালে কেমন হয়। তাহলে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ওর কথাকে নিশ্চয় গুরুত্ব দেবেন। এবং তাদের বিবেচনা মত এ-ঘটনাকে একবার তদন্ত করে দেখতে পারেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত পানুর মন সায় দিল না। ভাবল, দেখাই যাক না একবার চেষ্টা করে। যদি না পারি, তখন পুলিশের শরণাপন্ন হওয়া যাবে।

বেলা বাড়তে পানু একটা ছিপ জোগাড় করল। তারপর পিন্টুকে বলল, চলতো একবার নদীর পাড় থেকে ঘুরে আসি।

পিণ্টুর আর এখন কোন ভয় নেই। বরং প্রত্যেক অভিযানে পিণ্টু একটা রহস্যের স্বাদ পাচ্ছে। ওর দুঃসাহসের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়ছে। একটা রোমাঞ্চকর আনন্দের তৃপ্তি পাচ্ছে।

যেতে যেতে পিণ্টু বলল, আমার হাতে তো একটা কিছু থাকা দরকার। তাহলে দু'নের ছদ্মবেশ নিখুঁত হত।

পানু বলল, ঠিক বলেছিস। পানু সঙ্গে সঙ্গে একটা মাটির কলসী জোগাড় করল। আর কিছু কেঁচো মাটির সাথে মেখে কচু-পাতায় করে পিণ্টুর হাতে তুলে দিল।

নদীর কাছাকাছি যেতে একটা কালো লোককে ওরা দেখতে পেল। লোকটির হাতে একট ধারালো লম্বা কাটারী। সাধারণতঃ যেমন ধরণের কাটারী হয়, তার থেকে এই কাটারীটা অনেকটা বেশী লম্বা মনে হল।

লোকটি একটু তির্যক দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল। পানু বার কয়েক লোকটিকে দেখে নিল। তারপর সরাসরি নদীর ধারে গিয়ে বড়শিতে আধার লাগিয়ে ছিপ ফেলল।

পানু ফিস ফিস করে বলল, দেখতো লেকটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে কিনা?

হ্যাঁরে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

পানু বলল, বোধহয় কিছু সন্দেহ করছে। খুব সাবধান, এক-দম যেন কিছু বুঝতে না পারে।

ঈশ্বর যেন ওদের এই মুহূর্তে সাহায্য করলেন। পানুর ফাদনা জলের তলায় ডুবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পানু ছিপেতে টান দিল।

হ্যাঁ, একটা ছোট সাইজের মাছ আটকেছে। মাছের রঙটা একটু ফিকে লাল।

পিণ্টু আনন্দে বড়শি থেকে মাছটি খুলে মাটির কলসীতে রাখল।

পানু আবার বড়শিতে আধার লাগিয়ে ছিপ ফেলল। কিন্তু ওর মন জুড়ে আছে লোকটির দিকে। কেমন পেটানো শরীর। চোখ দুটো যেন বাজপাখীর মত জ্বলছে। লোকটি কিন্তু সেখান থেকে সরল না। বরং আর এক পা সামনের দিকে এগিয়ে এসে একটা বড় বট গাছের তলায় বসে পড়ল।

পিণ্টু বলল, দেখেছিস কত বড় শয়তান—দিব্যি আমাদের ওপর নজর রেখে বসে পড়ল।

পানু ফাদনার দিকে মুখ রেখে বলল, থাক, তুই বেশী তাকাসনা ওর দিকে। পিণ্টু সত্যি সত্যি আর তাকায়নি সেদিকে। কিন্তু মিনিট পাঁচেক পর লোকটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল ?

পিণ্টু প্রথমে একটু কেমন যেন ভয় পেল ! পানুকে বলল, এই লোকটিকে আর দেখা যাচ্ছে না, কোথায় গেল বলতো ?

এতক্ষণে পানু এবার তাকাল।

সত্যি লোকটিকে আর দেখা যাছে না। পানুও যেন কেমন ঘাবড়ে গেল। হঠাৎ পেছন থেকে আক্রমণ করে বসবে না তো ? হাতে যে ধারাল অস্ত্র দেখেছিল, তা থেকেই ওর এমন ধারণা জন্মালো। আর এই মুহূর্তে মনে হল—এই কাটারী দিয়েই বল্লুকে হত্যা করা হয়েছে।

পান্নুর তীক্ষ্ন দৃষ্টি একটা গাব গাছের গোড়ায় নিবদ্ধ হল। এই গ্যাব গাছটি সেদিন হঠাৎ খুব জোরে নড়তে দেখেছিল। মগ-ডালে লক্ষ্য করতেই, দেখতে পেল একটা বাইনাকুলারের মত কি যেন দেখা যাচ্ছে।

পান্নু এবার আরও তীক্ষ্ণ ভাবে তাকাল। নীচের অংশটা আরও ভালভাবে লক্ষ্য করা দরকার। কিন্তু শত চেষ্টা করা সত্ত্বেও পান্নু কিছুই দেখতে পেল না। কারণ গাব গাছের পাতা অত্যন্ত ঘন। গাছের ঝাড়ও বেশ গোলাকার। এখন যদি পান্নু সাহস করে এগিয়ে যায় তাহলে এ সম্পর্কে একটা নিশ্চিত ধারণা হতে পারে।

পান্নু বলল, তুই একটু দাঁড়া। আমি ওদিকটা একটু ঘুরে আসি।

কিন্তু পিণ্টু শুনলো না—সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিল। বলল, এখন গিয়ে কাজ নেই পান্নু। হাতে কিছু নেই—যে কোন একটা বিপদ ঘটতে পারে।

পিণ্টুর কথা শুনে পান্নু যেন নিজের যুক্তিকে দুর্বল মনে করল। শেষপর্যন্ত পান্নু এগোবার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করল। বলল, ঐ যে গাব গাছটি দেখছিস, ঐ গাছের ওপরই কালো লোকটি বসে আছে। একটু ভালভাবে লক্ষ্য কর—মগডালে পাতার ভেতর একটা বাইনাকুলারের মত কি যেন দেখা যাচ্ছে। আমার মনে হয় লোকটি ঐ গাছের ওপর বসে বাইনাকুলার দিয়ে আশে-পাশের সমস্ত দিকে লক্ষ্য রাখছে। আর এখন আমাদেরই দেখছে।

পিণ্টু বলল, তা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু আমার মতে এখনই এই স্থান ত্যাগ করা উচিত।

পান্নু ছিপ তুলে ফেলল। বলল, চল।

বাড়ী ফিরতে পান্নুর মা বললে, সকাল বেলায় তোরা কোথায় গিয়েছিলি? আমি লোক পাঠিয়ে খুঁজে পেলাম না।

পিণ্টু উত্তর দিল, মাছ ধরতে। এই দেখ একটা মাছ ধরে এনেছি।

পানুর মা বললে, মাছ ধরে এনেছিস, খুব ভাল কথা। কিন্তু রেশনের যে চাল ফুরিয়ে গেছে। খাবি কি? শীগ্গীর বাজার থেকে চাল কিনে আন। আমি উনুনে ভাত বসাতে পারছি না।

পানু টাকা নিয়ে বাজারে গেল। সঙ্গে পিণ্টুও রয়েছে।

বাজারে ঢুকে পানু পরিচিত দোকানে গেল। দোকানদার হেসে বলল, আমার চাল তো ফুরিয়ে গেছে।

পানু অন্য দোকানে গেল। কিন্তু দাম শুনে পানু অবাক। দোকানদার বলল, আমি তিন টাকার এক পয়সা কমে দিতে পারবো না।

পানুর মা আড়াই টাকা দিয়েছিল। এক কিলো চাল ও নেবে কি করে

পিণ্টু বলল, আমার কাছে এক টাকা আছে, এই নে—

তবু পানু আরো কয়েকটি দোকান ঘুরল। কিন্তু সবার মুখে একদর। যেন সবাই ষড়যন্ত্র করে বাজারে চাল বিক্রি করতে বসেছে।

বাজারের ডান দিকে একটা ভীড় জমেছে। ঐ দিকটা একটা বড় চালের দোকান আছে। সব সময় সেখানে চাল মজুত থাকে। কিন্তু ক্রেতারা আজ অতিষ্ঠ হয়ে দোকান ঘেরাও করেছে। ঘেরাও আজ জনসাধারণের মোক্ষম অস্ত্র! তাই এই ঘেরাও এর মাধ্যমে তারা দাবী জানিয়েছে—ন্যায্য দামে চাল দিতে হবে।

কিন্তু জনসাধারণের ভীড় বড় মজার। বাইরে সবাই সিংহনাদ করছে। কিন্তু বাকী কাজটুকু করবার কেউ সাহস পাচ্ছে না। সবাই বলছে, এক টাকা করে চাল দিতে হবে।

দোকানদার নারাজ। সে কিছুতেই দেবে না। সমস্ত জমায়েত সত্ত্বেও লোকগুলোর দাবীকে উপেক্ষা করছে।

পানু জানে—এ সমস্ত পরিস্থিতিতে সবাই নেতা হতে পারে না। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় কাজটি কেউ সহজে করতে পারে না। তবে এক বার যদি কেউ শুরু করে দিতে পারে—তাহলে বন্যার জলের মত সে কাজের গতি বয়ে যেতে পারে।

পানু ভীড় ঠেলে সামনের দিকে দাঁড়াল। বলল, আপনাকে এক টাকা কিলো দরে চাল দিতে হবে, নইলে আপনার দোকান লুঠ হবে।

উপস্থিত সবাই হা-রে-রে করে উঠল। তাদের মনের কথাই বলেছে পানু। হ্যাঁ, সহজ পথে আসতে হবে। আর শোষণ সহ্য হয় না। এবার একটা কিছু ঘটে যাক সব দিক থেকে।

সবাই বিকট চিৎকার করে বলল, ন্যায্য দামে চাল বিক্রি কর, নইলে দোকান লুঠ করবো।

পানুর সাথে পিণ্টুও রয়েছে। পিণ্টু অবশ্য এসব দৃশ্য কলকাতায় দেখেছে। কিন্তু কোনদিন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়নি। কেবল আজ পানুর সাথে এত ভেতরে এসেছে। আর একটা সত্য-বোধে উৎসাহিত হচ্ছে।

শেষপর্যন্ত দোকানদার গণ-বিক্ষোভকে উপেক্ষা করতে পারল না। এই শক্তি যদি সংবদ্ধ হয়, তাহলেই সব মুশকিল। নইলে তো জনসাধারণকে কে তোয়াক্কা করে! দিন ক্রমশঃ পালটাচ্ছে। জন-সাধারণ অন্যায়, অবিচার শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে। ওদেরই শক্তি বেশী। সঠিক ভাবে রুখে দাঁড়ালে, এখন এই সমাজ ব্যবস্থাকে দ্রুত ওরা পালটে দিতে পারে।

দোকানদার বেগতিক দেখে শেয়ানার মত সবিনয়ে বলল, ঠিক আছে আপনারা লাইন দিয়ে দাঁড়ান। আমি লোকসান দিয়ে সব চাল বিক্রি করে দেবো।

একজন ভীড়ের মধ্যে বলে উঠল, আহা রে, আমার বিনয়ের অবতার। এই বিনয় এতক্ষণ কোথায় ছিল? ঘেরাও দেখছি, জোলাপের মত কাজ করেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে লাইনে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। পানু জনা-দশেকের পরেই দাঁড়িয়েছিল। ও আড়াই টাকায় আড়াই কিলো চাল নিয়ে বাড়ী ফিরল।

॥ ৬ ॥

অফিস থেকে বিমলাপ্রসাদবাবু বাজারের পাশ দিয়ে ফির-ছিলেন দেখে চালের দোকানের মালিক দাশরথি মণ্ডল তাড়া-তাড়ি এগিয়ে এসে পানুর নামে অভিযোগ করলেন। বললেন, পানু আজ তাদের সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।

বিমলাপ্রসাদবাবু প্রথমে তো কিছুই বুঝতে পারলেন না। বললেন, কি হয়েছে বলবেন তো ?

দাশরথিবাবু অত্যন্ত আক্ষেপের সুরে বললেন, শুধু আপনার ছেলে বলে আমি কিছু বলিনি। অন্য কেউ হলে, আমি অন্য ব্যবস্থা করতাম। এত বড় স্পর্ধা, বলে কিনা আমার দোকান লুট করবে। আমি ভাবতে পারিনি, আপনার ছেলে ও-ভাবে চোখ রাঙিয়ে কথা বলবে।

অবশ্য সম্পূর্ণ দোষ ওর ঠিক নয়। দলে পড়ে অমন হয়েছে। একটু ছেলেকে দেখবেন বিমলাপ্রসাদবাবু। আপনাকে তো চিনি— আপনি কেম মানুষ! তাই এ কথা বললাম। অন্য কেউ হলে বলতাম না। ব্যাস্! আর কিছু বললেন না দাশরথি মণ্ডল। বিমলাপ্রসাদবাবুও একটু লজ্জিত হলেন। বললেন, ঠিক আছে আমি দেখছি বাড়ী গিয়ে।

বিমলাপ্রসাদবাবু বাকী পথটুকু মুখ গম্ভীর করে বাড়ীতে ঢুকলেন।

পিণ্টু একটা ছবি আঁকছিল। পানু একটা ব্যায়ামের বই পড়ছিল। কিভাবে দেহটাকে মজবুত রাখা যায়। দেহ-ই যে জীবনের মূলবস্তু তাতে পানুর মনে কোন সন্দেহ নেই।

সেদিন কি একটা বই পড়ছিল, তাতে লেখা ছিল, লোহার মত স্নায়ু আর শক্ত পাথরের মত দেহ হলে পৃথিবীতে তার মত খুব কমই শক্তিমান পুরুষ হয়।

কথাটা পানু পুরোপুরি উপলব্ধি করেছিল। সত্যি তো, শক্ত স্নায়ু, মজবুত দেহ আর জ্ঞানের আলো থাকলে, সে পৃথিবীতে অনেক কিছু মহৎ কাজ করে যেতে পারে।

বিমলাপ্রসাদবাবু প্রথমে ছেলের দিকে তাকালেন। এই পড়ার একাগ্রতা দেখে, তিনি একটু শান্ত হলেন। কারণ আর যাই হোক পানুর যে আজকাল জ্ঞান তৃষ্ণা জেগেছে, তা বিমলাপ্রসাদবাবুর অজ্ঞাত নয়। তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, এই ক' মাসের মধ্যে পানু অনেক নতুন নতুন বই পড়েছে। অনেক জিনিষ না বুঝতে পেরে পানু তাঁকেই জিজ্ঞাসা করেছে! বিমলাপ্রসাদবাবু যতদূর সম্ভব তা প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ল বিমলাপ্রসাদবাবুর। কথাটা হঠাৎ পানু বলেছিল। আচ্ছা বাবা, আমাদের চিন্তা করবার ক্ষমতাটা কি করে বাড়ানো যায়?

প্রশ্নটা প্রথমে খুব সহজ মনে হয়েছিল। তাই বিমলাপ্রসাদবাবু বলেছিলেন,—কেন বই পড়ে। বই তো চিন্তা করতে শেখায়, ভাবতে শেখায়। সর্বোপরি জীবন বিকাশের একমাত্র সহায়ক।

তারপর পানু প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু কি কি বই পড়লে, খুব দ্রুত ফল পাওয়া যায়, তেমন বই তো আমাদের তালিকাভুক্ত নেই বাবা!

বিমলাপ্রসাদবাবু কথা শুনে তখন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। বললেন, হ্যাঁ, নির্দিষ্ট করে তেমন কোন তালিকাভুক্ত বই নেই আমাদের। তবে এরই মধ্যে আমাদের বই বেছে নিতে হবে।

এই ঘটনার পর বিমলাপ্রসাদবাবু নিজের ছেলে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়েছেন। পানুকে কয়েক মাস অগে তিনি যা দেখেছিলেন,

এখন ও সম্পূর্ণ পালটে গেছে। পানুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখন আর তিনি শঙ্কিত নন। তাই বাইরে থেকে, এখন যদি কেউ কোন অভিযোগ করেন, তাতে আগের মত তিনি আর বিচলিত হন না বা ক্রোধে ফেটে পড়েন না।

বিমলাপ্রসাদবাবু জামা-কাপড় ছেড়ে বিশ্রাম নিলেন। তারপর পানুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজকে বাজারে কি গণ্ডগোল হয়েছে শুনলাম?

পানু বলল, হ্যাঁ বাবা, দাশরথিবাবু তিন টাকা দরে চাল বিক্রি করছিলেন, তাই সকলে দোকান ঘিরে ধরেছিল, একটাকা করে চাল বিক্রী করতে হবে। তখন আমিও চাল কিনতে গিয়েছিলাম। আমি তাদের সামনে গিয়ে দাবী জানালাম—এক টাকা করে চাল দিতে হবে।

কিন্তু দাশরথিবাবু প্রথমে আমাদের কথা শুনতে চাননি। দোকান লুঠ করবার ভয় দেখাতেই, তিনি একটাকা কিলো দরে চাল বিক্রী করেছেন।

বিমলাপ্রসাদবাবু ঘটনা শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। এ ঘটনায় কি রায় দেবেন, তা বোধ হয় তিনি ভাবলেন। অথচ দাশরথি মণ্ডলের অভিযোগের স্বপক্ষে রায় দেবার মত কোন যুক্তি তিনি খুঁজে পেলেন না।

পিণ্টু বলল, এখানকার লোকেরা তবুতো শান্ত। আমাদের কলকাতা হলে দাশরথিবাবুর দোকান থাকতো কিনা সন্দেহ।

বিমলাপ্রসাদবাবু পিণ্টুকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন না। বরং নীরব থেকে যেন পিণ্টুকেই সমর্থন করলেন।

পানু বলল, সবাই বলেছে, দাশরথিবাবু নাকি এই চালের ব্যবসা করে কলকাতায় দুটো বাড়ী করেছেন। একটা লরী করেছেন।

পিণ্টু বলল, করবে না, চালেতে কি কম লাভ হচ্ছে! প্রতি কিলোয় প্রায় দু' টাকার ওপর লাভ রাখেন, তাহলে বুঝে দেখ দিনে কত টাকা আমদানী করেন।

পানু মনে মনে হিসাব করে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, সত্যি! দাশরথিবাবুর যে এত টাকা বাইরে থেকে কিন্তু একদম বোঝা যায় না।

পিণ্টু বলল, বুঝতে দিলেই তো সব ফাঁস হয়ে পড়বে। ঐ জন্যই বোধ হয় সাধারণভাবে থাকেন।

বিমলাপ্রসাদবাবু বললেন, যাই হোক তোমরা বেশী গণ্ডগোলের মধ্যে যেও না। আজকাল সময়টা তো ভাল যাচ্ছে না। একটু বুঝে শুনে চলো।

॥ ৭ ॥

আজকে পানুর মাষ্টারমশাই অনেক দেরী করে এলেন। এত দেরী সাধারণতঃ তিনি করেন না। পানু ভেবেছিল, আজকে আর মাষ্টার-মশাই আসবেন না। মনটা একটু খারাপ হয়েছিল। কারণ পড়ার ফাঁকে ফাঁকে পানু অনেক কিছু জানবার বিষয় মাষ্টারমশাইয়ের কাছ থেকে জেনে নেয়।

এটুকু পানুর উপরি পাওনা। এই পাওনাই পানুর সবচেয়ে বেশী আনন্দ, বেশী উৎসাহ। তাই মাষ্টারমশাইয়ের উপস্থিতির জন্য পানু এই সময়ে গভীর আগ্রহে বসে থাকে।

মাষ্টারমশাইকে দেখে পানু যেন আনন্দে নেচে উঠল। বলল, আমি ভেবেছিলাম, আজকে আর আপনি আসবেন না।

মাষ্টারমশাই হেসে বললেন, না আসবার মতই হয়েছিল।

কেন, কোথায় গিয়েছিলেন মাষ্টারমশাই?

কলকাতায়।

ও বুঝেছি, আজকে কলকাতায় বড় মিটিং ছিল কম্যুনিস্টদের। আচ্ছা মাষ্টারমশাই, এই কম্যুনিস্ট কারা? সেদিন আমার ইস্কুলের এক বন্ধু বলছিল, আপনিও নাকি কম্যুনিস্ট?

মাষ্টারমশাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর অন্য প্রসঙ্গে যাবার জন্য চেষ্টা করলেন।

কিন্তু পানুর জেদ চেপে গেল। বলল, না মাষ্টারমশাই আজকে আপনাকে বলতে হবে, কম্যুনিস্ট কাদের বলে। নইলে আজকে ছাড়ছি না।

মাষ্টারমশাই কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, কেন, তুমি জান না কম্যুনিস্ট কাদের বলে?

একেবারে জানি না, তা নয় মাষ্টারমশাই। তবে জানাটা খুব স্পষ্ট নয়।

কিন্তু আমি যতটুকু বলবো, তাতে কি তোমার জানা স্পষ্ট হবে? কেন?

না, তা হয় না পানু। এজন্য তোমাকে পৃথক একটা সময় করে বই পড়তে হবে। অত্যন্ত গভীর পড়াশুনার বিষয়। শুধু কারো মুখে অথবা মিটিং শুনে কম্যুনিস্টদের বোঝা যায় না।

পানু নিস্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মাষ্টরমশাইয়ের দিকে। সেদিন কে বলেছিল, একজন খাঁটি কম্যুনিস্ট মানে, একজন বাস্তববাদী খাঁটি ঋষি। কথাগুলো ভাবতে গেলে পানুর যেন কেমন সব ওলট-পালট হয়ে যায়। অথচ পানু বোঝে এর মধ্যে একটা অতি সূক্ষ্ম সত্যবোধের ব্যাপার আছে। আর একটু বড় হলে ও নিশ্চয়ই এগুলি বুঝতে পারবে।

পানু বলল, আমি এ সম্পর্কে বই পড়বো মাষ্টারমশাই, তবে আজকে একটু আপনি বলুন।

মাষ্টারমশাই বললেন, কম্যুনিজমের যারা সমর্থক তাদেরই কম্যুনিষ্ট বলে, অর্থাৎ যারা সাম্যবাদে বিশ্বাসী। আর এই সামান্য

বিজ্ঞান ভিত্তিক মতবাদ সৃষ্টি করেছেন আমাদের পৃথিবীর মহান নেতা কার্ল মার্কস ও তাঁর বন্ধু এ্যাঙ্গেলস্। এই দুই মহান নেতা প্রথম পৃথিবীতে শেখান কেন এবং কিভাবে লড়তে হবে সাম্যের জন্য। সাম্য ছাড়া জীবনে শান্তি অসম্ভব। আর শান্তি না থাকার মানেই হল দেশের প্রগতির দ্বার রুদ্ধ হওয়া।

পানু বলল, কিন্তু সাম্যটা কিসের মাষ্টার মশাই ?

মানুষ হিসেবে বাঁচবার জন্য সমাজের সকল রকমের সুযোগ সুবিধের সমান অধিকার। আর এই অধিকারের ভিত্তিতেই আসে সাম্যবাদ। এ বিষয়েই তোমাকে ভাবতে হবে, পড়ে উপলব্ধি করতে হবে। অসংখ্য প্রশ্ন আর উত্তর এখান থেকেই শুরু হয়েছে।

পানু বলল, হ্যাঁ মাষ্টারমশাই, আমাদের ক্লাসে অনেক ছাত্র আছে, ওরা ভাল করে খেতে পায় না, বই কিনতে পারে না। ভাল জামা-কাপড় পরতে পারে না। ওদের দেখলে বড় দুঃখ হয় মাষ্টারমশাই। কত কষ্টে ওরা লেখা পড়া শিখছে। অথচ কেউ ওদের কথা ভাবে না।

মাষ্টারমশাই বললেন, তুমি ভাবো পানু। বড় হয়ে আরো পাঁচজনকে ভাবতে শেখাও। তাহলেই দেখবে এই অবিচার, এই অন্যায় সমাজ ব্যবস্থা ক্রমশঃ পালটে যাচ্ছে।

পানু সবিস্ময়ে চেয়ে থাকে মাষ্টারমশাইয়ের দিকে। কথা গুলির ভেতর কেমন যেন একটা প্রেরণা পায়। জীবনে বাঁচবার ও লড়বার হাতিয়ার গুলো এখন থেকে বুঝতে হবে। নইলে বোধহয় মানুষ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। তিলে তিলে এই শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। তারপর পূর্ণ উদ্যমে লড়তে হবে অসাম্যের বিরুদ্ধে।

মাষ্টারমশাই চলে যাবার পর পানু চুপ করে বসেছিল। একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। আসলে এটা পানুর অন্যমনস্কতা নয়, মাষ্টারমশাইয়ের কথাগুলির উপলব্ধির পরিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া।

পানুর এই প্রতিক্রিয়ায় বাধা পড়ল। পিণ্টু এগিয়ে এসে বলল,

মাষ্টারমশাইকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছে ছিল। আমি অনেকদিন ভেবেছি কথাটার অর্থ কি ?

কি কথা ?

আচ্ছা বুর্জোয়া কথাটার অর্থ কি জানিস ?

পানু বলল, এটা জার্মানী শব্দ ; এর অর্থ প্রগতি-বিরোধী। অর্থাৎ, যারা শুধু নিজেদের সুযোগ সুবিধা নিয়ে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে আঁকড়ে থাকতে চায়—তাদেরই বুর্জোয়া বলে।

পিণ্টু কথাটাকে উপলব্ধি করল। বলল, শ্রেণীশত্রু কাকে বলে রে ? আজকাল অনেকেই এ কথা বলছে। খবরের কাগজেও কয়েকবার দেখেছি।

পানু কিছুক্ষণ ভাববার চেষ্টা করল। বলল, না এটা ঠিক এখনও বুঝতে পারিনি। ঠিক আছে মাষ্টারমশাইকে কালকে জিজ্ঞাসা করব।

॥ ৮ ॥

সন্ধ্যে থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। কেমন যেন আবহাওয়াটা আজকে স্যাঁৎসেঁতে মনে হচ্ছে। কোন জায়গায় বসে পানু আরাম পাচ্ছে না। একটা কাপড় গায়ে জড়িয়ে পানু বিছানায় বসল।

রাত বাড়তেই বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃ বাড়তে শুরু করল। পানু যেন কেমন অসুস্থ বোধ করল। গায়ে একটু জ্বর জ্বর মনে হচ্ছে। ভেতরে যেন একটু সর্দি বসেছে।

পানু অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুয়ে পড়ল।

পিণ্টু জিজ্ঞাসা করল, কিরে শুয়ে পড়লি যে, আজকে বেরুবি না ?

না রে আজকে বোধ হয় বেরনো হবে না। শরীরটা আজকে ভাল লাগছে না ! বোধ হয় জ্বর এসেছে।

পিণ্টু গায়ে হাত দিয়ে বলল, হ্যাঁ, তাইতো দেখেছি। বেশ জ্বর এসেছে।

পানু বলল, মাকে এখন কিছু বলিস না। বাবার ঘরে হোমিও-

প্যাথিক ওষুধের বাক্স আছে। সেখান থেকে ক্যালকেরিয়া কার্ব 30-র গোটা কয়েক পুরিয়া নিয়ে আয়।

পিণ্টুর এ-কাজটা করতে ভাল লাগে। তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে ওষুধের বাক্সটা খুলল। কিন্তু সারি সারি ঐ ছোট্ট শিশির মধ্যে থেকে পিণ্টু প্রয়োজনীয় ওষুধ খুঁজে বের করতে পারল না। বিরক্ত হয়ে ও বাক্সটাই পানুর কাছে নিয়ে এল। হেসে বলল, আমি খুঁজে পাচ্ছি না। দেখতো কোনটা?

পানুর এতে পাকা হাত। বাবার কাছ থেকে অনেকদিন আগেই শিখেছে। ও অনায়াসে শিশিটা তুলে ওষুধ ঢেলে খেয়ে নিল।

বৃষ্টির বেগ আগের চেয়ে কম। একটু এলোমেলো বাতাস বইছে। আকাশের রঙ-ও একটু পালটেছে।

একটি নৌকা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। খুব সন্তর্পণে জল টানার শব্দ হচ্ছে।

আগের মত নির্দিষ্ট একটা আলো বৃত্তাকারে একবার ঘুরে গেল। নৌকার ভেতর থেকে কে যেন তার উত্তর দিল আলো দেখিয়ে।

ক্রমশঃ নৌকা পাড়ের কাছে আসতেই গত দিনের মত একটা মোটা দড়ি কে যেন ছুঁড়ে দিল। পাড়ের একটি ছায়ামূর্তি দড়িটা তৎপরতার সাথে ধরে নিয়ে একটা গাছের সাথে বেঁধে ফেলল মুহূর্তে।

নৌকার ভেতর থেকে একজন আগন্তুক বেরিয়ে এল। তার সর্বাঙ্গ কালো পোষাকে ঢাকা। হাতে একটা সরু ছড়ি। আগন্তুক নৌকা থেকে নেমে দ্রুত জঙ্গলে প্রবেশ করল। তারপর একটা উঁচু জায়গার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

আর একটি ছায়ামূর্তি সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে কুর্নিশ জানিয়ে একটা বড় তক্তা সরাল। তারপর ম্যানহোলের চেয়ে প্রায় চার গুণ বড় একটা মাটির রঙের মত লোহার পাত সরাল।

এবার আগন্তুকের ছড়ির ভেতর থেকে একটা উজ্জ্বল আলো বেরিয়ে এল। এই আলোয় সামনের জায়গাটুকু বেশ স্পষ্ট দেখা

যায়। ছোট ছোট সিঁড়ি প্রায় পাঁচ ফুট নেমে গেছে। তারপর পথটি যেন সমান্তরাল মনে হল।

আগন্তুক সুড়ঙ্গের মধ্যে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর আরো দু'জন সেখানে প্রবেশ করল।

ভেতরে সব সাজানো। এক নজরে প্রায় হাজার তিনেক বস্তা আছে বলে মনে হবে।

বস্তাগুলির দিকে তাকিয়ে আগন্তুকের মুখ চিন্তিত হয়ে উঠল। তারপর চারপাশ ভাল করে দেখল।

একজন আগন্তুকের দিকে চেয়ে বলল, এদিককার খবর ভাল নয় হুজুর। সেদিন দাশরথির দোকান প্রায় লুঠ হতে বসেছিল। আজকাল লোকগুলো হুজুর কেমন যেন পালটে গেছে। সবাই এক সাথে দোকান ঘেরাও করেছিল। দাশরথি বেগতিক দেখে এক টাকা কিলো দরে সব চাল বিক্রি করে দিয়েছে।

সব শুনে আগন্তুক বলল এ খবর আমি গতকাল পেয়েছি। দিন দিন অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে মনে হয় বেশীদিন আর এভাবে ব্যবসা চলবে না। গতকাল যে চাল এখান থেকে পাচার করা হয়েছিল, তা-ও লুঠ হয়ে গেছে।

আরেকজন আঁতকে বলল, কোথায় হুজুর ?

বি. টি. রোডের ওপর। নৌকা থেকে মাল খালাস খুব নির্বিঘ্নেই হয়েছিল। কিন্তু বাকী পথটুকু লছমন আর পার হতে পারেনি। ডানলপ ব্রীজের কাছাকাছি লরীটা আটকে দিল একদল লোক।

লছমন পালাবার চেষ্টা করেনি হুজুর ?

করেছিল। কিন্তু ওরা বোধ হয় আগে থেকে টের পেয়েছিল, এ রাস্তা দিয়ে রোজ ভোরবেলায় চাল পাস হয়। তাই আগে থেকে ওরা রাস্তা ব্যারিকেড করে রেখেছিল। ওরা শুধু চাল লুঠ করেনি, লছমনকে বেশ মারধোর করেছে।

এখন লছমন কোথায় আছে হুজুর ?

হাসপাতালে।

মুহূর্তে লোকটির মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

আগন্তুক বলল, ভয়ের কিছু নেই। আমি ওকে বের করে আনবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।

লোকটি বলল, এদিককার খবর তেমন ভাল নয় হুজুর। দুটি ছেলে কদিন থেকে বড্ড ঘুরঘুর করছে।

আগন্তুক চিন্তিত হয়ে বলল, বয়স কত ?

তা পনেরো ষোল হবে।

একটু স্বস্তি প্রকাশ করে আগন্তুক বলল, ও কিছু নয়।

না হুজুর, ওরা বড্ড শেয়ানা। আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। মাথায় বেশ বুদ্ধি রাখে।

এবার আগন্তুক বলল, বেশী বাড়াবাড়ি দেখলে একেবারে সরিয়ে দেবে। লোকটি কথা বুঝতে না পেরে বল, এত চাল আমি এখন কোথায় সরাবো হুজুর। চারিদিকে লোকজনের সতর্ক দৃষ্টি। দেখতে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে লুঠ করে নেবে।

লোকটি আক্ষেপের সুরে আবার বলল, দিব্যি হচ্ছিল হুজুর। ঐ সব কতগুলি লাল-ঝাণ্ডার দল জুটেছে। ওরাই সব ভোগেতে এখন কাঁটা দিচ্ছে হুজুর। আসলে সহ্য হচ্ছে না, কেন বাবা তোরাও মওকা বুঝে দু'পয়সা কামিয়ে নে।

আরেকজন বলল, কামাবে কি—মগজে সেই বুদ্ধি থাকলে তো! শুধু চায়ের দোকানে একটা-দুটো চা, আর চারমিনারের শ্রাদ্ধ করে দেশের কথা ভাবছে। দেখবো তোরা কতদূর করতে পারিস!

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর লোকটি বলল, আজকে তাহলে চাল যাবে না হুজুর ?

না, ক'দিন বন্ধ থাক। রাস্তাঘাটের অবস্থা একটু ভাল হোক। তারপর আবার শুরু করা যাবে।

আগন্তুক আর দাঁড়াল না। ভাল করে চারপাশ ঘুরে দেখল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল।

আগন্তুক বলল, বাইরের দিকটা—বেশ ভালভাবে নজর রাখবে।

যেন কোন রকম টের না পায়। ধরা পড়লে একেবারে সব সর্বনাশ হবে। আর যে ছেলে দুটো আশেপাশে ঘুরছে, সুযোগ পেলে ওদের গুম করে দেবে। বডি নদীর জলে ভাসিয়ে দিও না। কারণ পুলিশের নজর ঠিক এড়ানো যাবে না। রাত্রিতে নৌকা এলে, বড় কাঠের বাক্স করে পাঠিয়ে দেবে। তারপর সুবিধেমত যা ব্যবস্হা করার আমি করবো।

লোকটি মাথা নেড়ে জবাব দিল, আচ্ছা হুজুর।

॥ ৯ ॥

পরদিন পানুর জ্বর ছেড়ে গেছে। আজকে ও সম্পূর্ণ সুস্হ। মনটা চাঙ্গা হয়ে আছে রহস্যের নেশায়। যেমন করেই হোক এর একটা বিহিত করতে হবে।

ক্রমশঃ দিনের আলো ফুরিয়ে এল। অন্ধকারের রেশ ক্রমশঃ গভীর হল। কিন্তু এ-কদিনের তুলনায় আজকের অন্ধকার তেমন ঘন হল না। পানু ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখল, আজকে শুক্ল পক্ষ। আকাশে চাঁদ তাই জ্বল জ্বল করছে। নক্ষত্রগুলি যেন চুমকির মত বসানো রয়েছে। পানু একবার বাইরে এসে ভাল করে আকাশের দিকে তাকাল। কি অসীম বিস্তৃতি! মাঝে মাঝে এই সৃষ্টি রহস্যের দিকে তাকিয়ে পানু অবাক হয়ে যায়। সামান্য জ্ঞানে পানু কিছুই বুঝতে পারে না। না বুঝুক, ক্ষতি নেই। কিন্তু পানুর এই দৃশ্য দেখতে এখন ভাল লাগছে!

পিণ্টু ঘরে ছিল। পানুকে দেখতে না পেয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। শহুরে ছেলে। কখনও চারিপাশের গাছপালার মধ্যে দাঁড়িয়ে পূর্ণিমার চাঁদ দেখেনি। আর দেখার মধ্যে যে কোন আগ্রহ বা সৌন্দর্যবোধ থাকতে পারে সে বিষয়েও কোনদিন পিণ্টু চিন্তাও করেনি। কিন্তু আজ পানুর পাশে দাঁড়িয়ে ওর নয়নপটে কে যেন একনতুন ছবি এঁকেদিল। ও অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল।

পানুর মা রান্না ঘর থেকে ওদের লক্ষ্য করছিলেন। প্রথমে তিনি কিছু বুঝতে পারেননি। ভাবছিলেন, এই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে

ওরা কি দেখছে ? তারপর জানালা দিয়ে উঁকি মারতে, সেই আনন্দ রূপের স্পর্শ তিনি নিজেও পেলেন। কোন বাধা দেননি। মুহূর্তটাকে উপযুক্ত মূল্য দিয়েছেন। চুপ করে তিনি আবার নিজের কাজে ব্যস্ত থেকেছেন।

রাত আরেকটু বাড়তে খাওয়া দাওয়া শেষ হল। বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে পানু উঠে বসল। সঙ্গে পিণ্টুও উঠল। তারপর খুব সন্তর্পণে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল।

আজকে আর হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে না। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে রাস্তাঘাট। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা সেই জঙ্গলের ধারে গিয়ে পেঁছিল।

এবার খুব সতর্ক হয়ে ওরা হাঁটতে শুরু করল। একটু যেন শব্দ না হয়। কারণ একটু শব্দ বা অন্য কোন অবস্থার সৃষ্টি হলে আজকে আর অন্ধকারে গা ঢাকা দেওয়া যাবে না।

নদীর ধারে আসতেই, দেখতে পেলো দুটো নৌকা পাড়ে ভেড়ানো রয়েছে। সেদিনকার মতই খুব দ্রুত সব বস্তা উঠছে নৌকার ভেতর।

পিণ্টু নিঃশ্বাস চেপে বলল, আমার মনে হচ্ছে, জঙ্গলে চালের বস্তা লুকনো রয়েছে। রাত্রিতে এখান থেকে চাল নিয়ে বাজারে চালান দেওয়া হয়।

এ সম্বন্ধে পানুরও কোন সংশয় রইল না। কিন্তু পানুর কাছে প্রশ্ন জেগে উঠল – এ চাল কোথা থেকে আসছে ? জঙ্গলেই বা কোথায় এদের চাল রাখবার ব্যবস্থা রয়েছে ?

পানু কৌতূহল দমন করতে পারল না। ক্রমশঃ একটা উৎসুক বোধ যেন ওকে নাড়া দিতে লাগল। এই মুহূর্তে মনে হল এখনই সুযোগ দেখবার, এই চাল কোথা থেকে আসছে।

পানু বলল, তুই এখানে দাঁড়া, আমি আরেকটু এগিয়ে দেখে আসি।

পিণ্টু সম্মতি দিতে একটু ইতস্ততঃ করল। তারপর বলল, খুব সাবধানে যাবি। টের পেলে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলবে।

পানু বুক ভরে নিঃশ্বাস চেপে এগোতে লাগল। এখন অনেক কাছে। কিন্তু তবুও লোকগুলো কোথা থেকে বস্তা গুলি নিয়ে আসছে ঠিক বোঝা গেল না। কারণ ও যে জায়গা থেকে লক্ষ্য করছে, সেখানে কয়েকটি বড় গাছ ওর দৃষ্টির পথকে কিছুটা ব্যাহত করছে। আর একটু এগোতে পারলে সব মীমাংসা হয়ে যেতো।

কিন্তু আরো একটু এগনো মানে যে বিপদের ঝুঁকি নেওয়া পানু এখন বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করছে। ও খুব সন্তর্পণে নিঃশ্বাস চেপে নিজের চারপাশ একবার দেখে নিল। তারপর ছোট একটা গাছ থেকে একটা ডাল ভেঙে নিল। ডালটিতে বেশ বড় বড় পাতা রয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে সেই গাছের ডাল সামনে রেখে পানু এগোতে লাগল। দূর থেকে মনে হবে শুধু একটা ছোট গাছই কেবল। কিন্তু এর পেছনে যে পানু আত্মগোপন করে আছে তা সহজে বোঝা যাবে না।

পানু এবার সব দৃশ্য সহজেই দেখতে পাচ্ছে। একটা বড় গর্ত থেকে লোক গুলো উঠে আসছে। এবার সহজেই অনুমান করল, এই গর্তের ভেতর সুড়ঙ্গের মত একটা কিছু আছে। কিন্তু কবে করল এই সুড়ঙ্গ? অথচ এদিককার কেউ টের পেল না। তা বোধহয় বহুদিন এই সুড়ঙ্গ পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। এখন এটাকে সংস্কার করে নিজেদের কাজে লাগিয়েছে। এই প্রশ্ন গুলি পর পর পানুর মনে জেগে উঠল। স্থির হয়ে মিনিট কুড়ি পানু বসে বসে এই দৃশ্য দেখল। কি বিশাল চেহারা, কোমরে সেই লম্বা কাটারীর মত অস্ত্রটা ঝুলছে, আর সে-ই সব দাঁড়িয়ে তদারকী করছে।

এবার চাল নেওয়া বন্ধ হল। কালো মত লোকটি এবার গর্তের প্লেটটি চাপা দিল। সমস্ত রহস্য যেন মুছে গেল। কে বুঝবে এর তলায় এত গোপন রহস্য রয়েছে।

লোকগুলো এবার নদীর ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল। পানুও আর বৃথা সময় নষ্ট না করে সেখান থেকে সরে এল। ও জানে, যা দেখবার ওর দেখা হয়ে গেছে। এখনও অপেক্ষা করা মানে অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া। আর তার পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, নিজেকে শত্রু-পক্ষের হাতে ধরে দেওয়া।

এতক্ষণে পিণ্টু অস্থির হয়ে উঠেছিল। একটু ভয় পেয়েছিল তা ওর চোখ মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

পানু আর কথা বলল না। ইশারায় ওকে অনুসরণ করতে বলল। দ্রুত জঙ্গল পার হয়ে বাড়ীতে গিয়ে পেঁছিল। তারপর চুপচাপ শুয়ে পড়ল।

॥ ১০ ॥

বেলা বাড়তেই কালো মত লোকটিকে একটু চঞ্চল দেখা গেল। হঠাৎ ওর নজর পড়েছে কতগুলি পায়ের দাগের ওপর, যে দাগ কোনদিন দেখা যায়নি এই সীমানার মধ্যে। লোকটি এবার নিশ্চিত, নিশ্চয় কেউ টের পেয়েছে ওদের গোপন আস্তানার। নইলে এত কাছে এসে পায়ের চিহ্ন রেখে যেতে পারে না।

লোকটি আরো আশ্চর্য হয়েছে ভাঙা একটি গাছের ডাল দেখে। কে ভাঙ্গল এই ডাল? অথচ সারাদিন ওর সজাগ দৃষ্টি। কোন কাক পক্ষী পর্যন্ত ওর নজর এড়াতে পারেনি। এই সেদিনও কুকুরটি এদিকে বেশী ঘোরাফেরা করেছিল বলে ওকে এক ঘায়ে সাবাড় করে দিয়েছে। এখন বাকী রয়েছে ছেলে দুটি। ওদেরও গতিবিধি ভাল ঠেকছে না। সুযোগ পেলে একদিন ওদেরও সাবাড় করে দেবে।

দাগ গুলি বেশ ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখল রহমান। হ্যাঁ, বয়স একটু কমই মনে হচ্ছে। দেহের ওজনও কম। নইলে মাটিতে দাগ গুলি আরো গভীর হতো।

রহমান আর দেরী করল না। হন হন করে বাজারের দিকে এগিয়ে গেল। একটা দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে একটা দর্জির দোকানে ঢুকলো।

চোখে ইশারা করতেই দর্জি বেরিয়ে এল। ওর চেহারা রহমানের মতই ষণ্ডামার্কা। গায়ের রঙ মোষের মত কালো কুচকুচে। রহমান বলল, খবর ভাল নয় রসুল। ছেলে দুটো সব টের পেয়েছে। কাল রাত্রিতে সুড়ঙ্গের সামনে এসেছিল। স্পষ্ট পায়ের ছাপ রয়েছে।

রসুল বিশ্বাস করল না। বলল, দুর!

রহমান গুরুত্ব দিয়ে বলল, তুই দেখবি চল। এখনই সব খোলসা হয়ে যাবে। রসুল তবুও বিশ্বাস করতে পারল না। বলল, কি বলছিস আবোল-তাবোল। ওরা করবে টিকটিকির কাজ। এত বছর কারবার করে এলাম, টিকিটা পর্যন্ত কেউ ধরতে পেল না, আর ধরবে কিনা ঐ দুটো দুধে-খোকা।

তুই তো সব জানিস রহমান। কটা লাশ আমার হাত দিয়ে গেছে। আর কেমন দিব্যি দর্জি সেজে লোকের সামনে ঘুড়ে বেড়াচ্ছি।

রহমান কিন্তু ভরসা পেল না। বলল, অত কথার দরকার নেই। তুই বরং একবার পায়ের ছাপগুলি দেখে যা। তারপর যা হয় একটা ব্যবস্থা কর।

তাই হল। রসুল গায়ে একটা জামা চড়িয়ে বেরিয়ে এল সেখান থেকে। জঙ্গলে পেঁছে, দাগ দেখে রসুলের আর সন্দেহ রইল না। দাগ দেখে স্পষ্ট বুঝল, হ্যাঁ, এখানে ওৎ পেতে শালারা সব দেখেছে।

রসুল মুহূর্তে জঙ্গলের চারিধার একবার দেখে নিল। চোখ ওর এখন আগুনের ভাটার মত জ্বলছে।

রহমান বলল, সময় থাকতে এখনই সরিয়ে দেওয়া ভাল রসুল। নইলে শুধু একটা ভুলের জন্য দলের সব শুদ্ধ ধরা পড়ে যাবে।

রসুল বলল, কোন দিকটায় থাকে ছেলে দুটো?

আমার কাছে ঠিকানা লেখা আছে।

তুই কবে জোগাড় করলি?

দিন তিনেক আগে।

ঠিক আছে দে। আজই শালা গায়েব করে দেবো।

কখন করবি ?

মাঝ রাতে, একবারে বডি শুদ্ধু পাচার করে দেবো।

তুই একা যাবি ?

রসুল একটু চিন্তিত হয়ে বলল, একা একা একটু অসুবিধে হবে। তুই চল না ?

ঠিক আছে, দশটা নাগাদ আমি দোকানে চলে যাবো। রহমান এবার চিন্তিত হয়ে বলল, খবরটা একবার বড়বাবুকে দেয়া দরকার। কাজটা খুব সহজ হবে না কিন্তু।

এখন আর সময় কোথায় ? বরং সময় নষ্ট করলে আরো বিপদ হতে পারে। তবুও রহমান যেন সায় দিতে পারল না। বলল, না রসুল, খবরটা একবার বড়বাবুকে দেয়া দরকার। এসব খুন খারাপের ব্যাপার, এতটা ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।

রসুল বলল, খুন না হয় পরে করা যাবে। আগে বডি তো তুলে নিয়ে আসি। আর তা ছাড়া বড়বাবুরতো এতে মতই আছে। সেদিন তো বলেই গেল, সুযোগ পেলেই বডি সরিয়ে দিতে।

এবার রহমান যেন যুক্তি খুঁজে পেল। বলল, তা মন্দ হয় না। ধরে এনে ঘরে ফেলে রাখি। তারপর বড়বাবু যা হয় করেবন।

শেষপর্যন্ত ঐ কথাই পাকা রইল। রসুল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বাজারের দিকে চলে গেল। রহমান শ্যেন দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল জঙ্গলের ভেতর।

॥ ১১ ॥

পানুর অনুসন্ধান যা হবার হয়ে গেছে। এখন কিভাবে এই মজুত চাল আর লোক সমেত এই জায়গাটি ঘিরে ফেলতে পারে সেটাই এখন চিন্তার বিষয়।

পানু আজ রাতে আর বেরল না। কালকে এ সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা ব্যবস্থা করবে। এবং রাত্রির দিকে সেই অভিযান ফলপ্রসূ হবে।

রাত গভীর হয়ে এল। বাড়ীর সবাই একে একে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হল। দুটো ছায়ামূর্তি যেন দেখা গেল পানুদের বাড়ীর সামনে। খানিকক্ষণ তারা একসাথে একটি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রইল। বাড়ীর অবস্থাটা যেন ভালভাবে দেখে নিল। তারপর একজন অবলীলাক্রমে প্রাচীর টপকে বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়ল।

খুট করে একটা শব্দ হল। সদর দরজা খুলে গেল। দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি মাথা নীচু করে বাড়ীর উঠোনের ভেতর ঢুকল।

দরজার পাশে খোলা জানালা। একজন তার লম্বা হাত বাড়িয়ে অনায়াসে ঘরের খিল খুলে ফেলল। ভেতরে নিশ্চয় পানু আর পিণ্টু অকাতরে ঘুমচ্ছে।

দুজনেই খুব সন্তর্পণে ঘরের ভেতর ঢুকল। একজন খাটের মশারী তুলে একটা রুমাল নাকের সামনে তুলে ধরল। বেশ মিষ্টি গন্ধ। মুহূর্তেই যেন সেই গন্ধের প্রতিক্রিয়া শুরু হল। ঘুমের মধ্যে স্নায়ুগুলি যেন আরো অবশ হয়ে এল।

প্রথম ছায়ামূর্তি খুব চাপা গলায় বলল, আরেক জন কোথায় ?

দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি একটু অবাক হয়ে বলল, কেন নেই ?

কই দেখতে পাচ্ছি না তো !

ভাল করে দেখ, নিশ্চয় আছে।

প্রথম ছায়ামূর্তি আবার ভাল করে তাকাল বিছানার দিকে। বলল, না নেই।

দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি বলল, কি জানি কালাচাঁদ তো খবর দিয়েছিল দুজনেই এ ঘরে শোয়। খানিকক্ষণ দুজনে কি জানি ভাবল। তারপর বলল, ঠিক আছে এটাকে নিয়ে চল। খুব সহজেই একজন পিণ্টুর অসাড় দেহটা তুলে নিল, তারপর দরজা ভেজিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি বলল, তুই এটাকে নিয়ে দাঁড়া। আমি অন্য ঘরগুলি দেখি।

প্রথম ছায়ামূর্তি আপত্তি জানাল। বলল, দরকার নেই, এটাকেই নিয়ে চল।

ভোর হতেই পানুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। আজকে পানু মার বিছানায় শুয়েছিল। মার ঘর থেকে এসে দেখে পিণ্টুর বিছানা শূন্য। পিণ্টু ঘরে নেই।

প্রথমে পানু খুব একটা চিন্তিত হল না। ভাবল, হয়তো ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেড়াতে গেছে। কিন্তু ঘণ্টা খানেক কাটার পর পানু শঙ্কিত হল। কই পিণ্টু তো আর ফিরে আসছে না।

পানু বাড়ীতে কিছু না বলেই বাইরে খুঁজতে বেরুলো। জঙ্গলের চারিপাশ, বাজারের মধ্যে, স্টেশনের দিকটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল। কিন্তু কই, পিণ্টুর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

পানুর এবার সত্যি সত্যি কান্না পেল। ভেতর থেকে কেমন একটা নিঃসহায়ের বেগ যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। ও ঠোঁট দুটি চেপে সেই বেগকে প্রশমিত করার চেষ্টা করল। কিন্তু পানু শেষপর্যন্ত পারল না। ও রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিল।

বাড়ী ফিরবার সময় পানু ভাবল, হয়তো পিণ্টু অন্য রাস্তা দিয়ে বাড়ী যেতে পারে। কারণ পিণ্টু যে বাড়ী থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, এ-কথা ও কল্পনা করতে পারছে না। ও তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এল।

কিন্তু কই? পিণ্টু এখনও বাড়ী ফেরেনি।

কনকলতা সকাল থেকে খাবার নিয়ে বসে আছেন। পানুকে দেখে বললেন, কিরে তোরা কোথায় গিয়েছিলি বলত? সেই কখন থেকে খাবার নিয়ে বসে আছি—পিণ্টুকে ডেকে খাবার খেয়ে নে!

পানু ভীত হয়ে বলল, মা সকাল থেকে পিণ্টুকে খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি কি ওকে কোথাও পাঠিয়েছো?

কনকলতা অবাক হলেন। বললেন, না তো, আমি তো ওকে কোথাও পাঠাইনি। ও গেল কোথায়?

কি জানি। আমি ঘুম থেকে উঠে ওকে দেখতে পাচ্ছি না। ভাবলাম বোধহয় বাইরে বেড়াতে গেছে। কিন্তু সব রাস্তায় খুঁজে এসেছি মা। ওকে পেলাম না।

কনকলতার বুক এবার কেঁপে উঠল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পানুর বাবাকে বললেন, পিণ্টুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

সব শুনে বিমলাপ্রসাদবাবু খুব একটা গুরুত্ব দিলেন না। বললেন, যাবে আবার কোথায়, বোধহয় অন্যদিকে বেড়াতে গেছে। এখুনি ফিরে আসবে।

কিন্তু পানুর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বিমলাপ্রসাদবাবু এবার চিন্তিত হলেন। ভাবলেন, তাইতো এতবড় ছেলে একেবারে বিনা কারণে ঘর থেকে চলে গেল। না অন্য কোন লোকের পাল্লায় পড়ে, অন্য কোথায় গেল! এইরকম অসংখ্য চিন্তা সব জড় হতে লাগল বিমলাপ্রসাদবাবুর মনে।

কনকলতার চোখ দিয়ে এবার জল নেমে এল। তিনি কি জবাব দেবেন পিণ্টুর বাবা-মার কাছে। পিণ্টু একমাত্র ছেলে তাদের—একথা যত তিনি ভাবতে লাগলেন, ততই তিনি মনের সংযত ভাবকে হারাতে লাগলেন।

পানুর হঠাৎ মাষ্টারমশাইয়ের কথা মনে পড়ল। এমন বিপদে মাষ্টারমশাইয়ের সাহায্য বা পরামর্শই সবচেয়ে উত্তম মনে হল। ও মাষ্টারমশাইয়ের বাড়ীর দিকে ছুটলো।

মিনিট কুড়ির রাস্তা পানু খুব অল্প সময়ের মধ্যে পেঁছে গেল। কিন্তু বাড়ীতে গিয়ে শুনলো মাষ্টারমশাই গতকাল কলকাতায় গেছেন! কলকাতা থেকে আবার এক জায়গায় যাবেন। সেখান থেকে ফিরতে প্রায় আরো দিন দু'য়েক লাগবে।

পানুর এবার বুক যেন ভেঙ্গে পড়ল। হতাশায়, ক্ষোভে, ভয়ে দু'চোখ বেয়ে জল নেমে এল। সমস্ত শরীরে যেন ক্লান্তির ছাপ এসে পড়ল। গলা প্রায় শুকিয়ে এল। পানু এখন কি করবে? কোথায় ও যাবে?

কোনরকমে সেখান থেকে ফিরে এসে ভাবল, একবার পার্টি অফিসে যাবে কিনা। মাষ্টারমশাই বলেছিল, যদি কোন বিশেষ দরকার হয়, তাহলে যেন পার্টি অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করি। মাষ্টারমশাই না থাকলেও পার্টির লোকেরা সব ব্যবস্থা করে দেবে।

কিন্তু পানুর মন এবার সায় দিল না। কেমন একটি অবসন্নভাব ওকে নিষ্ক্রিয় করে তুলছে। ওর চিন্তাশক্তিকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে।

পানু এবার সোজা বাড়ী ফিরে এল।

বিমলাপ্রসাদবাবু আজ আর অফিসে গেলেন না। থানায় খবর দেবার জন্য ভাবতে লাগলেন। পাশের বাড়ীর আরেক ভদ্রলোক বললেন, থানায় খবর দেয়াটা সঙ্গত হবে বিমলাপ্রসাদবাবু। আপনি ওর কোন ফটোগ্রাফ নিয়ে এখুনি খবর দিয়ে আসুন। দেরী করাটা ঠিক হবে না।

বিমলাপ্রসাদবাবু আর দেরী করেননি। বাড়ীতে একটা গ্রুপ ফটোর সাথে পিন্টুর ছবি ছিল, সেটাকে নিয়ে তিনি থানায় উপস্থিত হলেন। তারপর সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি ছবিখানি থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের হাতে দিলেন। অফিসার ছবিখানি নিয়ে বললেন, কত বছর আগেকার ছবি ?

গত বছরের।

ঠিক আছে কিছু ভাববেন না। আমরা এখুনি সব ব্যবস্থা করছি।

ফিরে আসবার সময় বিমলাপ্রসাদবাবুর গলা যেন ভেঙ্গে এল। কোনরকমে বললেন, একটু দেখবেন স্যার,পরের ছেলে, নিজের ছেলে হলে এত নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়তাম না।

॥ ১২ ॥

একটা সঁ্যাৎসেতে অন্ধকার ঘরের মধ্যে পিণ্টুর অসাড় দেহটা পড়ে আছে। মাঝখানে একটা বুড়ো মত লোক লণ্ঠন হাতে পিণ্টুকে একবার দেখে গেল। তার মিনিট পাঁচেক পর পিণ্টুর জ্ঞান ফিরে এল।

কিন্তু ও চোখের পাতা সহজে খুলতে পারছে না। চোখের পাতা কেমন ভারী ভারী ঠেকছে। চারিদিক অন্ধকার। একটা দুর্গন্ধ নাকে এসে লাগছে। মেঝেটা কি শক্ত। সমস্ত গায়ে কেমন একটা অস্বাভাবিক ব্যথা।

একটু ভাল করে তাকাতে পিণ্টু অবাক হয়ে গেল। ও কোথায় এল! আরেকবার ভাল করে তাকাল পিণ্টু। কিন্তু তবুও সহজে বিশ্বাস করতে পারছে না।

গত রাতের কথা পিণ্টু স্মরণ করতে লাগল। কোন বিছানায় ও শুয়েছিল ?

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। পানু খাওয়া দাওয়া সেরে বই পড়তে মাসিমার বিছানায় বসেছিল। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায়নি। কয়েকবার ডাকা হয়েছিল পানুকে। পানুর ঘুম ভাঙ্গেনি। শেষে পানু ঐ বিছানায় শুয়েছিল। কিন্তু পিণ্টু একা সেই ঘরে শুয়েছিল। দরজাও ভাল করেই বন্ধ করেছিল। কিন্তু এখানে ও এলো কি করে ? আর এখানেই বা আসার কি কারণ থাকতে পারে ? এরকম নানা প্রশ্ন এসে ভীড় করতে লাগল ওর মনে, কিন্তু এর কোন সদুত্তর খুঁজে পেল না পিণ্টু।

বাইরে থেকে দরজা খোলার শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে পিণ্টু চোখ বুজল। কেন বুঝলো, ও জানে না। বোধহয় চোখ বুজেই অনুভবে শুধু অবস্হাটা বুঝতে চাইছে। এতে আত্মরক্ষার চেষ্টাটা যেন কিছুটা নিরাপদ মনে হল।

এবার আগের সেই বুড়ো লোকটি আসেনি! বাজারের সেই দর্জি রসুল এসেছে। গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জী, পরণে লুঙ্গী। গলায় বাঘ নখের লকেট ঝুলছে।

রসুল কাছে এসে পিণ্টুর দেহটাকে বার কয়েক ঝাঁকুনি দিল। প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে পিণ্টু মিটমিট করে চাইল! আগে থেকেই গলা ওর শুকিয়ে গিয়েছিল। এখন কতকটা ভয়ে গলাটা আরো তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠল।

রসুল এবার বাজখাঁই গলায় বলল, কি নাম তোর ?

পিণ্টু ভয়ে কোন জবাব দিল না। শুধু একবার চোখ বড় বড় করে তাকাল রসুলের দিকে। কোনদিন দেখেনি একে পিণ্টু। কে এই লোকটা ?

রসুল এবার কর্কশ গলায় বললে, কথা কানে যাচ্ছে না ? পিঠে বেত পড়লে কথা বেরুবে ?

পিণ্টু কোনরকমে এবার নিজের নামটা বলল।

রসুল বলল, আরেকজন কোথায় ছিল ?

পিণ্টু এবার প্রশ্নটা বুঝল না। শুধু তাকিয়ে রইল রসুলের দিকে।

রসুল রক্তচক্ষু করে বলল, ন্যাকা সাজা হচ্ছে, যেন কিছু বোঝ না। হতভাগা রোজ জঙ্গলের ধারে গিয়ে কি দেখতিস ?

কই, কিছু না তো !

ফের মিথ্যে কথা বলছিস—এবার এক থাপ্পড় লাগাবো।

পিণ্টু ভয়ে এবার কুঁকড়ে গেল। চোখ দুটো ওর ছল ছল করে উঠল। বাবা মার কথা মনে পড়ছে। বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিচ্ছে। চোখ বেয়ে ওর জল নেমে এল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে পিণ্টু কাঁদতে শুরু করল।

লোকটা বলল, যত ইচ্ছে এখানে বসে কাঁদ হতভাগা। কেউ এখানে তোর কান্না শুনে আদর করতে আসবে না। এতটুকু ছেলে গোয়েন্দা সাজবার সখ হয়েছে। ভেবেছিস, আমরা কিছু টের পাইনি। মজাটা দেখবি এবার—বড়টাকে ধরে আনি। তারপর দুটোকে একসাথে ভবনদী পার করে দেবো।

পিণ্টু বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি বাড়ী যাবো। আমাকে কেন তোমরা ধরে এনেছো ?

রসুল দাঁত খিচিয়ে বলল, তোমাকে পুজো করবার জন্য ধরে এনেছি। হারামজাদা তখন মনে ছিল না ? ভেবেছিলি আমরা কানা,

আমরা কিছু দেখতে পাই না। তাই না? আমরা সব খবর রাখি। ভেবেছিস, ঐ মাষ্টার অমলের কাছে লেখাপড়া শিখলে, বড় বেশি চালাক হয়ে যাবি। এবার সব বেটাকে একসাথে খাঁচায় পুরবো। চাল লুঠ করা এবার বের করে দেবো।

পিণ্টু সভয়ে বলল, আমি তো এখানে থাকি না। আমি কি দোষ করেছি?

চোপরাও হারামজাদা। এবার কথা বলবি তো মুখ ভেঙ্গে দেবো। কম্যুনিষ্টগিরি এবার বার করে দেবো। বড্ড বেশী লাল ঝাণ্ডা চিনেছিস!

পিণ্টু এবার চুপ করে গেল। কেমন একটা বিচ্ছিরি গন্ধ রসুলের মুখ থেকে পেল! ওর গা বমি বমি করে উঠল।

রসুল চলে গেল। বাইরে থেকে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

পিণ্টু এবার বুঝতে পারল, কারা ওকে ধরে এনেছে। কিন্তু এরা টের পেল কি করে? সব সময় তো ওরা সতর্ক হয়ে চলাফেরা করেছে। আশ্চর্য!

এবার পিণ্টুর জঙ্গলের কালো লোকটির কথা মনে পড়ল। সেদিন ওদের অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করেছিল। নিশ্চয় তখন থেকে ওদের সন্দেহ হয়েছিল। পানুরই দোষ। সব সময় বেপরোয়া ভাব। কখন টের পেয়ে গেছে। আবার কান্না পেল পিণ্টুর। কি করবে ও এখন?

পিণ্টু শান্ত হল। চোখ মুছে ভাবতে লাগল, এখন পালাবার কি উপায়? এভাবে চুপ করে তো বসে থাকলে চলবে না। নিজেকে বাঁচাবার জন্য বুদ্ধি ওকে খুঁজে বার করতেই হবে।

পিণ্টু উঠে দাঁড়াল। শরীরটা যেন দুর্বল মনে হচ্ছে। অন্ধকারে আন্দাজ করে ও এগিয়ে গেল দরজার সামনে। ছোট্ট একটা ফুটো দিয়ে বাইরের আলো দেখা যাচ্ছে। বেশ প্রখর আলো। বোধহয় এখন দুপুর বেলা।

দরজায় টোকা দিয়ে দেখল, বেশ মোটা কাঠের দরজা। পাশের দেওয়ালটা পুরণো হলেও বেশ মজবুত আছে। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, সামান্য আলো আসছে সেখান দিয়ে। জায়গাটা অনেকটা ফাঁকা, সেখান দিয়ে নিশ্চয় আরো বেশী আলো আসা উচিত ছিল। কিন্তু সেখানে চড়াই পাখী বাসা বেঁধে, বাইরের আলো আসার পথটি সংকীর্ণ করে তুলেছে। পাখীর বাচ্চাগুলো এখন খুব চেঁচাচ্ছে। বোধহয় ওদের মা বাচ্চাগুলোকে খাওয়াচ্ছে। পিণ্টু জানে, খাবার সময় বাচ্চাগুলো অমন করে চেঁচিয়ে থাকে।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পিণ্টু সরে এল সেখান থেকে। যেখানে ছিল, সেই সতরঞ্চির ওপর এসে বসল। কি করা যায়, কোন পথই তো খুঁজে পাচ্ছে না। ভয়ানক খিদে পেয়েছে ওর। লোক-গুলো কি নিষ্ঠুর! এত বেলা হয়ে গেল, একটু খাবার না, এক গেলাস জলও দিল না ওকে।

পিণ্টু কখন আবার ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে টের পায়নি। ঘুম ভাঙ্গল, যখন হটাৎ আবার দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল।

সেই লোকটাই আবার এসেছে। সঙ্গে একটা এনামেলের থালা। তাতে কিছু ডাল-ভাত-তরকারী।

থালাটা রেখে লোকটা বলল, এই খাবার রইল। আর ঐ ডান দিকে কুঁজো রয়েছে, দরকার পড়লে জল গড়িয়ে খাবি।

লোকটা আর দাঁড়াল না। যেন কোন দরকারী কাজ পড়ে আছে, এমন একটা ভাব দেখিয়ে চলে গেল।

খাবারের দিকে তাকিয়ে পিণ্টুর প্রথম ঘৃণাই হল। ভাত খাবে কিনা ও ভাবতে লাগল। কিন্তু পেটে যে খিদের আগুন জ্বলছে, তা কি করে রোধ করা যাবে? পিণ্টু আর দেরী না করে কয়েক মিনিটের মধ্যে ভাতের থালা শূন্য করে দিল। আরো কয়েক থালা ভাত পেলে ভাল হতো। কিন্তু তা আর পাচ্ছে কোথায়! ঢক্ ঢক্ করে জল খেয়ে পিন্টু খিদে তেষ্টার জ্বালা মেটাল।

পানু আজকে আর ভাল করে খেতে পারেনি। সমস্ত বাড়ীতে একটা বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে। খবর পেয়ে কলকাতা থেকে পানুর এক কাকা এসেছেন। তিনি অভিজ্ঞ লোক। এরমধ্যে তিনি একবার থানার ও-সির সাথে দেখা করে এসেছেন।

বিমলাপ্রসাদবাবু এখন দুঃশ্চিন্তায় কাতর। কনকলতার সেই একই অবস্থা। শেষপর্যন্ত পিণ্টুকে যদি না পাওয়া যায়—তাহলে তিনি কি করবেন তা তাঁর চিন্তা বাইরে।

সন্ধ্যের দিকে পানু একবার জঙ্গলের দিকে গেল। সেই কালো লোকটা তখন হনহন করে বাজারের রাস্তার দিকে হেঁঠে চলেছে। পানুর কি মনে হল, সঙ্গে সঙ্গে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

লোকটি দেখতে পেলো না। খানিকটা এগোবার পরেই পানু ওকে অনুসরণ করল।

বাজার ছাড়িয়ে লোকটি আরেক পাড়ায় গিয়ে ঢুকল। এদিকটা বস্তির মত। নিম্ন শ্রেণীর পেশাদারী লোকের বাস এখানে। কোন সময়েই একতা নেই। সব সময় মারামারি, খিস্তি—খেউর চলেছে। এ-এক কদর্য সামাজিক চিত্র।

লোকটা আরো খানিকটা এগিয়ে একটা পুরণো বাড়ীতে ঢুকল। বাইরে থেকে দেখে মনে হবে এটি একটি পরিত্যক্ত বাড়ী। কিন্তু আসলে তা নয়। দু'একজনকে মাঝে মাঝে এখানে দেখা যায়। কেন এরা আসে, কি করে, তা কিছুই স্পষ্ট বোঝা যায় না।

পানু আর এগোয়নি। একটা অতি নোংরা চায়ের দোকানে বসে বাড়ীটার দিকে নজর রাখতে লাগল।

মিনিট কুড়ি পর লোকটি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল। সঙ্গে আরেকটি বুড়ো মত লোক।

খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন বলাবলি করল। তারপর লোকটি আবার ফিরে হাঁটা শুরু করল।

কিন্তু পানু ফিরে গেল না। কেমন যেন অনুমানে একটা নতুন রহস্যের ঘ্রাণ পাচ্ছে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস. এই বাড়ীতে একটা নতুন কিছু মজুত করা আছে। যা ওর এখুনি একবার গোপনে দেখা উচিত।

পানু সাহসভরে এগিয়ে গেল পুরণো বাড়ীটার সামনে। সতর্ক দৃষ্টিতে চারিপাশ ভাল করে দেখল। তারপর ঢুকে পড়ল বাড়ীটার ভেতর।

একটি প্রাণীরও স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্ত বাড়ীটায় কেমন একটা থমথমে ভাব।

পানু একটা সরু পথ দিয়ে বাড়ীর অন্দর মহলে ঢুকে পড়ল। একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ঘর গুলি ভাল করে দেখল। সব ঘর গুলি বাইরে থেকে শেকল তোলা। কেবল একটা কোণের ঘরে একটা বিরাট তালা ঝুলছে। পানু এগিয়ে গিয়ে সেই ঘরের দরজার ফুটো দিয়ে দেখবার চেষ্টা করল।

ব্যর্থ চেষ্টা। ভেতরে জমাট বাঁধা অন্ধকার ছাড়া আর কিছু ওর নজরে পড়ল না। পানু অন্যভাবে দেখবার চেষ্টা শুরু করল।

কিন্তু অকস্মাৎ সেই প্রয়াসে বাধা পড়ল। ওপর থেকে একটা লোক যেন নীচে আসছে। স্পষ্ট তার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

পানু তাড়াতাড়ি একটা আলমারির আড়ালে গিয়ে লুকলো।

হ্যাঁ, পানু যা সন্দেহ করেছিল ঠিক তাই হল। সেই বুড়ো মত লোকটা তালাবন্ধ ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর একটা মোম-জ্বালিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকলো।

পানু আলমারির আড়াল থেকে গভীরভাবে কান পেতে আছে। ভেতরের কোন কথা যদি শোনা যায়।

ঠিক স্পষ্ট শোনা গেল না। তবে বুড়ো মত লোকটা বেশ বিরক্ত হয়ে গেছে। বার দুয়েক গাল দিল যেন কাকে।

পানু এবার নিশ্চিত হলো ভেতরে লোক আছে। কিন্তু কে আছে?

ওর মনে আশার এক ক্ষীণ আলো জেগে উঠেছে। যদি সত্যি ও এখানে পিণ্টুকে পেয়ে যায়। তাহলে ও কি করবে?

সমস্ত দেহের রক্তের গতি যেন হঠাৎ বেড়ে গেল। শ্বাস-প্রশ্বাস যেন বড় করে পড়তে লাগল। পানু দৃঢ় সংকল্পে হাতের মুঠি দুটো শক্ত করে ধরল। হ্যাঁ, ওর নিশ্চিত ধারণা এখানে পিণ্টু আছে। যেমন করেই হোক ওকে দেখতে হবে।

খানিক পর বুড়ো মত লোকটা আবার বেরিয়ে এল। ঘরের তালাটা বন্ধ করে আবার ওপরে চলে গেল।

পানু এবার দুঃসাহসিক হয়ে আলমারির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তারপর ঐ স্বল্প ফুটো দিয়ে আবার দেখবার চেষ্টা করল।
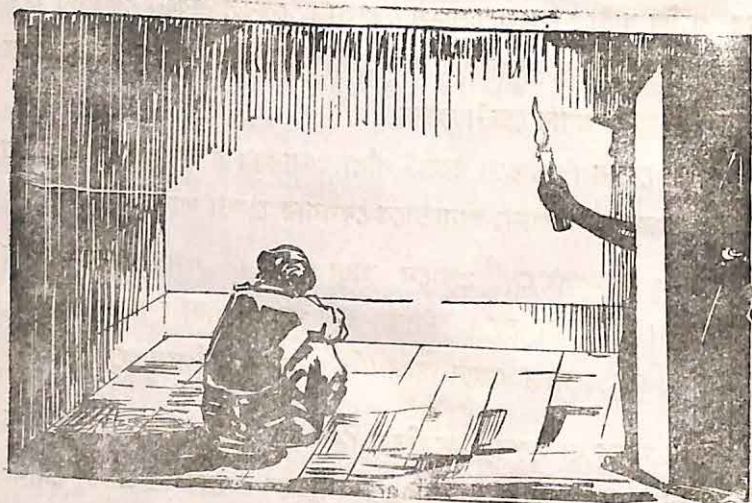
পানু মোমবাতির আলোয় কাকে যেন দেখতে পাচ্ছে।

হ্যাঁ, এবার পানু মোমবাতির আলোয় কাকে যেন দেখতে পাচ্ছে। মাথা গুজে চুপ করে বসে আছে কে?

পানু এবার খুব আস্তে ডাক দিল --পিণ্টু, পিণ্টু, আমি পানু এসেছি।

পিণ্টু যেন হঠাৎ নব জীবন ফিরে পেল। তড়াক করে লাফ দিয়ে একেবারে দরজার সামনে এল। বলল, পানু আমি এখানে। আমাকে বাঁচা। ওরা আমাকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছে। আমাকে বোধহয় মেরে ফেলবে।

পানু বলল, ভয় পাস না পিণ্টু। আমি গোপনে সব জেনে গেলাম। আজ রাতেই আমি পুলিশ নিয়ে আসবো। তোর কোন ভয় নেই।

পিণ্টু ভয়ে ভয়ে বলল, ওরা বোধহয় আমাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেবে। যত তাড়াতাড়ি পারিস পুলিশে খবর দিস।

পানু বুক ভরে সাহস নিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমি আর একদম সময় নষ্ট করছি না। আমি এখুনি যাচ্ছি। তুই ভয় পাস না।

পানু এবার সতর্ক হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল। তারপর বাজ-পাখীর মত যেন উড়ে গেল। ওর এখন দুরন্ত গতি। বাইরের কোন বাধাই এখন ওর গতিকে রোধ করতে পারবে না। পিণ্টুর মুক্তির আকুতি এখনও ওর কানে লেগে আছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে পানু পেঁছে গেল বাড়ীতে।

ওর কাকা বাড়ীতেই ছিলেন। বাবা বিমলাপ্রসাদবাবু চিন্তিত হয়ে বসেছিলেন।

মুহূর্তের মধ্যে পানু সমস্ত ঘটনা বলল। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হল। তারপর তিনজনে থানার দিকে ছুটলেন।

থানায় খবর পেয়ে স্বয়ং ও. সি. নিজেই জীপ গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। সঙ্গে তারা তিনজন। আর পেছনে এক ভ্যান পুলিশ।

ব্যাপারটা যেন কয়েক মিনিটের মধ্যে নাটকীয় হয়ে উঠল। প্রতি মুহূর্তে যেন উত্তেজনা ফেটে পড়তে লাগল। ও. সি. কয়েকজন পুলিশ নিয়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুকলেন।

প্রথমে ও. সি. সেই বুড়ো মত লোকটাকে বিনা বাধায় গ্রেপ্তার

করলেন। তারপর পিণ্টুকে যে ঘরে আটকে রেখেছে, তার তালা ভাঙ্গার নির্দেশ দিলেন।

বাইরে শব্দ শুনে পিণ্টু এতক্ষণে সতেজ হয়ে বসেছে। ও নিশ্চিত বুঝেছে, পানু পুলিশ নিয়ে এসেছে। এবং সত্যি সত্যি যখন তালা ভেঙ্গে ওকে বের করে আনল—পিণ্টু সেই মুহূর্তে পানুকে আনন্দে জড়িয়ে ধরল।

কিন্তু থানার ও. সি. এখন সময় নষ্ট করতে চান না। এখন তাঁর অনেক কাজ বাকী। কারণ পানু যে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়েছে — তা যদি সত্য হয়, তাহলে ও. সি.-র কর্ম জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে।

ও.সি. তাদের তুলে নিয়ে খুব দ্রুত জীপ গাড়ীর দিক পরিবর্তন করলেন। যত শীগ্‌গীর সেই জঙ্গল ঘিরে ফেলা যায়, ততই তাঁর কাজের দিক থেকে সুবিধে হবে। আচমকা আক্রমণ করে প্রতিপক্ষ-দলের উপস্থিত বুদ্ধিকে বিমূঢ় করে দিতে হবে। এবং সেই সুযোগে এক রকম বিনা রক্তপাতেই, সেই সমস্ত সমাজ শোষণকারী দস্যু-গুলির হাতে হাত-কড়া লাগাতে হবে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রথমে ও. সি.-র জীপ গাড়ীখানি নিঃশব্দে জঙ্গলের ধারে এসে দাঁড়াল। পেছনে কয়েকখানি পুলিশ ভ্যান। ও. সি.-র নির্দেশমত পুলিশ বাহিনী মুহূর্তে সমস্ত জঙ্গলটি ঘিরে ফেলল।

কোন রকম বাধা নেই। একেবারে মৃতের মত মনে হল এই শয়-তানের আড্ডাকে। ও. সি. এগিয়ে গেলেন গোপন জঙ্গলের ভেতর।

পানু দূর থেকে দেখালো—ঐখানে একটা ম্যানহোলের মত জায়গা আছে। ইস্পাতের প্লেট দিয়ে তা ঢাকা।

ও. সি. যেন এবার একটু সতর্ক। তাঁর চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হল যেন, একটা বিস্ফোরক কোন পদার্থকে তিনি নিরীক্ষণ করছেন। কারণ, ঘটনার শেষ যবনিকা যে শুরু হতে চলেছে।

চারিদিক ভালকরে দেখে নিয়ে, ও. সি. প্লেট তুলবার আদেশ

দিলেন। সবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শুধু সেই জায়গাটুকুতে। এবার দেখা যাক অন্য কোন বিপদ্‌জনক ঘটনা ঘটে কিনা।

একটি পুলিশ বীর বিক্রমে প্লেটটি তুলে ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক গুলি বেরিয়ে এল সেই সুড়ঙ্গ থেকে।

ভাগ্যভাল কারো গায়ে লাগেনি। কারণ গুলীর নিশানা ওপরের দিকে ছিল। কিন্তু পুলিশ বাহিনী এই আগ্নেয়াস্ত্র আক্রমণে একটু বিচলিত হয়ে পড়ল।

ও. সি.-কে এবার চিন্তিত দেখা গেল। ব্যাপারটা যতটা সহজ মনে হয়েছিল, ততটা সহজ নয়। এত সহজ ভাবে তারা আত্মসমর্পণ করবে বলে মনে হল না।

ও. সি. এগিয়ে গেলেন আরেক জুনিয়র অফিসারের নিকট। কি যেন পরামর্শ করলেন। তারপর সুড়ঙ্গের মধ্যে টিয়ার গ্যাস ছাড়বার আদেশ দিলেন!

একেবারে মোক্ষম দাওয়াই! পর পর দশ রাউন্ড শেল ছাড়া হল সুড়ঙ্গের ভেতর। কাজের দিক থেকে এই যথেষ্ট। বাইরে থেকে বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে টিয়ার গ্যাসের ঘনত্ব। বাইরেও কিছু এসে পড়েছে। অনেক পুলিশের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। পানু ঘন ঘন রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে।

মিনিট পনেরো পরেই ফল পাওয়া গেল। পরপর চারজন লোক সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল। এরা আর মুখ তুলে তাকাতে পারছে না। দেখে মনে হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

পুলিশ দল তৎপর হয়ে উঠল। তারা সময় নষ্ট না করে এগিয়ে গিয়ে হাতে হাত-কড়া লাগাল।

কিন্তু এই চারজন আসামীর মধ্যে একজন আসামীকে দেখে সবাই অবাক হল। একটু ভালভাবে দেখলে চেনা যাবে—ইনি সেই বাজারের দাশরথি মণ্ডল। যার চালের দোকান লুঠ হবে বলে পানু একবার ভয় দেখিয়েছিল।

দূরে বিমলাপ্রসাদ বাবু, ও. সি., সবাই অবাক। কারণ এই ভদ্র-লোক শুধু চালের ব্যবসায়ী হিসেবেই পরিচিত নন, নানারকম

সমাজ কল্যাণমূলক কাজের তালিকায় তার নামটা বেশ সহজেই চোখে পড়ে। এই সূত্রে পাড়ার অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তির সাথে তার আলাপ। কিন্তু এই দৃশ্য চোখে দেখলে যে সহজে বিশ্বাস হয় না। এমন মেকী ভালবাসা আর মিথ্যে সাহচর্যের মুখোস পরে মানুষ যে কত বড় শয়তান হতে পারে—তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল আজ এই দাশরথি মণ্ডল।

ও. সি. তাদের ভ্যানে পুরে থানায় নিয়ে এলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কৌশলের জন্য রক্তপাত ঘটল না। বরং তাঁর এই সহজ আর অনায়াস প্রয়াসের সাফল্যের জন্য তিনি নিশ্চয় মনে মনে গর্বিত হয়েছেন। আর পানুর তৎপরতায় অবাক হয়েছেন।

এর পরদিন সুড়ঙ্গ থেকে সমস্ত চাল উদ্ধার করা হল। এত চাল যে, এই সুড়ঙ্গের ভেতর থাকতে পারে বিশ্বাস করা যায় না। খবর পেয়ে নানা জায়গা থেকে লোক এসেছে। প্রেস-ফটোগ্রাফাররা হুমড়ি খেয়ে ছবির পর ছবি তুলছে। তাদের কাছে এ এক সালসা খবর। দেশের এই খাদ্য সংকটের দিনে, যে সমস্ত ব্যবসায়ী এই অমার্জনীয় অপরাধে লিপ্ত, তাদের যেন কোনরকম ক্ষমা করা না হয়। এরকম একটা ভাব পাড়ার লোকেরা জানাল।

সব শেষে অনেকে বলাবলি করল, পানুর জন্যই এটা ধরা গেল। ওর সাহসিকতা ও বিচক্ষণতা সত্যি প্রশংসনীয়।

আবার কেউ কেউ বলল, দিল্লীতে এই বিশেষ ঘটনা ঠিক মত পরিবেশিত হলে—পানু নিশ্চয় একটা উৎসাহব্যঞ্জক পুরস্কার পাবে।

কিন্তু পানু এই পুরস্কারের জন্য লালায়িত নয়। পুরস্কার না পেলেও পানুর এই উদ্যম, সাহসিকতা ও বিচক্ষণতা কোনদিন খর্ব হবে না। বরং উত্তরোত্তর এই গুলি ওর বৃদ্ধি পাবে। কারণ, পানু একটি আসল কথা শিখেছে—জ্ঞানই শক্তি। এবং সেই শক্তির উৎস বিভিন্ন বই। পানু জানে, বুঝবার এবং বিচার করবার শক্তি যতদিন থাকবে, ততদিন পানু পুরুষ সিংহ হয়ে বাঁচবে। জীবনে সব রকম সাফল্য আসবে। কোন বাধা বা বিঘ্ন ওর অগ্রগতির পথকে রোধ করতে পারবে না।